M.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ

এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

M.Phil.

GIFT

382730

Dhaka University Library
382730

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আশফাক হোসেন

এম. ফিল. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি নং ৮৩/৯৩-৯৪

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ এই শিরোনামে অদ্যবধি কোন কাজ হয় নি। বর্তমান গবেষণার ফলে এই অপূর্ণতা দূর হবে আশা করি। এই গবেষণাটি সমাপ্ত করা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ও বাংলা একাডেমীর যৌথ সহযোগিতায়। এই দুই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার ঋণ অনেক। ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ডঃ এ.বি.এম. মাহমুদ আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ব্যক্তিগতভাবে গবেষণার বিভিন্ন জটিল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এঁরা দুজনই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। বাংলাদেশের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির চেয়ারম্যান প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ এই গবেষণার জন্য সব সময় অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁর এই আশীর্বাদ আমার জীবনের পাথেয়। বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ও খ্যাতিমান মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ডঃ সুকুমার বিশ্বাস বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, নুরুলহুদা আবুল মনসুর, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, খালেদ হোসাইন, আনিস রহমান, আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, নাঈমুল ইসলাম নমি ও মাসুদুল হক প্রমুখ এই গবেষণা কর্মে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমান গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত যত্নের সাথে কম্পিউটারে প্রস্তুত করেছেন মিসেস খালেদা পারভীন রিতা। তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

382730

গবেষণা কাজে বিভিন্ন লাইব্রেরি ব্যবহার করতে হয়েছে। এগুলো হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, গণউন্নয়ণ গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশ আর্কাইভস। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই বিশেষ মুহূর্তে আমার জন্মদাতা বাবা মাকে স্মরণ করছি। জনাব সৈয়দ রশীদুন নবী ও মিসেস নাসরিন নবী গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্যে সবসময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাদেরকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। নাম না জানা অনেকের মুখাবয়ব এই মুহূর্তে ভেসে ওঠেছে তাদেরও স্মরণ করছি অশেষ কৃতজ্ঞতায়। বিভিন্ন জটিলতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ নির্ধারিত সময়ে জমা না দিয়ে কিছুদিন সময় বাড়িয়ে নেয়া একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আমার ভিতরে একটা জেদ ছিল যে, নির্ধারিত সময়ে গবেষণাটি জমা দিব। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ তা সম্ভব হয়েছে। ফলে এই গবেষণা কর্মে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি, মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে। এই ব্যর্থতার দায় একান্তই আমার। আশাকারি গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় তা দূর করা যাবে।

আশফাক হোসেন
গ্রাম ও ডাকঘর সাধুহাটি
জেলা- মৌলভী বাজার-৩২০০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে, তখন এর উত্তাপ শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় থেমে থাকে নি বরং বিশ্বব্যাপী তা অনুভূত হয়। দেখা দেয় বিচিত্র আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া। বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় এই মানবিক রাজনৈতিক সংকটে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত, দ্বন্দ্বমূলক এবং সাফল্য ব্যর্থতায় মিশ্রিত। বিতর্কিত এ কারণে যে, সে সময় উদার গণতন্ত্রী এবং সমাজতান্ত্রিক বলয়ের মানুষ মনে করেছিলেন যে, গণহত্যা বন্ধ ও শরণার্থীদের ভারত গমনের স্রোত বন্ধে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বন্দমূলক এ কারণে যে, সংস্থাটি সনদের কিছু ধারা (আর্টিকেল ২/৪ ও ২/৭) এবং বৃহৎ শক্তি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান ঘেঁষা নীতির কারণে স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণে দ্বিধান্বিত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত মুসলিম বিশ্ব, চীন ও তার প্রভাবিত দেশের সরকারগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। তখন ভারত আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রায় মিত্রহীন ছিল এবং একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যতীত ভারতের বন্ধু সংখ্যা খুবই কম ছিল। এসবই ব্যর্থতার অনুষঙ্গ। তবে সাফল্যও ছিল। বিশেষ করে শরণার্থী সমস্যাজনিত মানবিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতিসংঘের উদ্যোগ ইতিবাচক ছিল।

382730

মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার অবরুদ্ধ বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে 'নরকে' পরিণত হয়। শহর বন্দর গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক নিরাপত্তার সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। শেষাবধি তারা ভারতের মাটিতে শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু শরণার্থীদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং শিবির পরিচালনা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ে। এর সঙ্গে ছিল কলেরা মহামারি আর মৃত্যুর মর্মান্তিক হাহাকার। এটি ছিল এক অভূতপূর্ব মানবিক পরিস্থিতি যা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শরণার্থী সমস্যার জন্ম দেয়। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার অফিস (UNCHR) এই প্রতিকূলতা মোকাবিলায় এগিয়ে আসে। সংস্থাটির প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান সে সময় এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, "জাতিসংঘ সিস্টেমের সামনে এ পরিস্থিতি হচ্ছে একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ"। ***Basic Facts About United Nations*** (New York : 1992) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সংকটে জাতিসংঘ তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ত্রাণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করে'। জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্ট বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্য প্রদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ , সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান। মহাসচিবের এ আবেদনের পর বাংলাদেশ সংকট ও শরণার্থী পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও সাধারণ পরিষদের মানবিক কমিটি একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিশেষ করে কলেরা মহামারি রোধ, জামাকাপড় সরবরাহ এবং বুভুক্ষ মানুষের খাদ্য সংস্থানে ভারতের সাথে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার অফিস মূল কেন্দ্রবিন্দু (Focal point) হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ জাতিসংঘের উদ্যোগের ফলে বিপর্যয়ের হাত থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পায় লাখ লাখ উদ্বাস্তু মানুষ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে জাতিসংঘের উদ্যোগ প্রথমদিকে খুব একটা লক্ষ্য করা যায় নি। সনদ অনুযায়ী বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত। এছাড়া মহাসচিব এবং সাধারণ পরিষদের কিছু সীমিত ক্ষমতা রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিবেচনা করলে দেখা যায়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মহাসচিব তার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন যা ফলপ্রসূ হয় নি। ১৯৭১ সালে মহাসচিব উথান্ট বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের পরিপূরক ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশন ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়। তখন বিষয়টি সম্পর্কে ৫৭টি দেশ বক্তব্য প্রদান করে। তবে এ সময় কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে কোন প্রস্তাবও উথাপিত হয় নি। অবশ্য মার্কিন প্রশাসনের মূল কুশীলব হেনরী কিসিঞ্জার মুজিবনগর সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর অধীনে একটি সমঝোতার পরিকল্পনাও তৈরী ছিল। কিন্তু তাজউদ্দিন আহমেদের সময়োচিত পদক্ষেপ ও ভারতের সতর্কতার কারণে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিমান ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করলে উপমহাদেশে শুরু হয় ৭০ কোটি মানুষের যুদ্ধ। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হয়। বৃহৎ শক্তিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের শুরুতে মুজিবনগর সরকারের (প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার) প্রতিনিধি দলের নেতা আবু সাঈদ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো প্রশ্নে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে তীব্র বাক-বিতন্ডা চলে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, তাকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া হবে না তবে পরিষদে তার লিখিত একটি পত্র বিলি করা হবে। অর্থাৎ এক ধরনের পরোক্ষ স্বীকৃতি দেয়া হয়।

382730

বাংলাদেশ সংকট প্রশ্নে তিন দিন ক্রমাগত বৈঠক চলে। পরিষদে প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব উথাপিত হয়। কিন্তু ভেটো ক্ষমতার নির্বিচার প্রয়োগ নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রস্তাব উথাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ড স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এ দুটো দেশ কিছু প্রস্তাব উথাপন করলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রয়োগ করে। এসব প্রস্তাব উথাপনের সময় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করে যা শতাধিক দলিলপত্রে লিখিত রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এসব দলিলপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয় এবং বিষয়টি সাধারণ পরিষদে স্থানান্তরিত হয়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। অধিবেশন শুরু হলে ৩৪টি দেশ আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে একটি প্রস্তাব উথাপন করে। এ প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় (১০৪-১১) পাস হয়ে যায়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, প্রস্তাবটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য সুখকর ছিল না। কারণ ঐ প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে কার্যত অস্বীকার করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয়।

১২ ডিসেম্বর পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে বসে। তবে কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় এবং তখন উপমহাদেশের নতুন বাস্তবতা বিশ্বের সব রাষ্ট্রই মেনে নেয়। ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত একটি প্রস্তাবে এর প্রতিফলন দেখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	ঃ	তাত্ত্বিক কাঠামো	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংগ্রামের পটভূমি, স্বীকৃতি প্রশ্ন ও জাতিসংঘ	৮
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	শরণার্থী সমস্যা, বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘ	২৮
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে বহুপাক্ষিক কূটনীতি ও জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া	৭০
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ	৯২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	১৪ দিনের যুদ্ধ, বাংলাদেশ প্রশ্নে নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদের অধিবেশন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়	১০৯
উপসংহার	ঃ		১৪৪
পরিশিষ্ট ক.	ঃ	বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের পরিচিতি	১৪৮
পরিশিষ্ট খ.	ঃ	Poland Revised Draft Resulation	১৫১
গ্রন্থপঞ্জি	ঃ		১৫২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি সূচি

সারণি ২.১ .....৯

সারণি ২.২ .....১০

সারণি ২.৩ .....১১

সারণি ২.৪ .....১২

সারণি ২.৫ .....১২

সারণি ২.৬ .....১৩

সারণি ৩.১ .....৩১

সারণি ৩.২ .....৩২

সারণি ৩.৩ .....৩৫

সারণি ৩.৪ .....৩৭

সারণি ৩.৫ .....৩৭

সারণি ৩.৬ .....৩৮

সারণি ৩.৭ .....৩৮

সারণি ৩.৮ .....৪১

সারণি ৩.৯ .....৪৩

সারণি ৩.১০ .....৫৮

সারণি ৩.১১ .....৬০

সারণি ৩.১২ .....৬১

সারণি ৩.১৩ .....৬১

সারণি ৪.১ .....৮১

সারণি ৬.১ .....১১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি আলোক সঞ্চারী ঘটনা। একটি আঞ্চলিক সংকট থেকে ক্রমশ এটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে রূপান্তারিত হয়। এই সংকটে জাতিসংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দুটো পর্যায়ে এই ভূমিকা প্রতিফলিত হয়। ক. মানবিক বিষয় যেমন ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি শরণার্থীদের ভরণ পোষণ এবং দখলীকৃত বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ রোধে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা। খ. ডিসেম্বরে যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক প্রশ্নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ । অবশ্য মহাসচিব ডিসেম্বরের পূর্বে দু একটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জাতিসংঘ এমন একটি বিশ্ব সংস্থা যেখানে প্রধানত বৃহৎ শক্তিগুলোর সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। কোন একটি বিশেষ ইস্যুকে বৃহৎ শক্তিগুলো কিভাবে মুল্যায়ন করছে ; সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রধানত তারই প্রতিফলন ঘটে। বৃহৎ শক্তিগুলোর ঐকমত্য ব্যতীত জাতিসংঘ কোন কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে না। এই জন্যে বৃহৎ শক্তিগুলোর ভেটো ক্ষমতা মূলত দায়ী। নিরাপত্তা পরিষদে অচলবস্থা দেখা দিলে সাধারণ পরিষদ সীমিত পর্যায়ে কিছু উদ্যোগ নিতে পারে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশে সংকট চলাকালে এই সবকিছুই ঘটেছে। বিশ্বসংস্থায় বৃহৎ শক্তিসহ বিভিন্ন দেশের সরকারি মনোভাব সহস্রাধিক দলিল পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই দলিলপত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মানব জাতির সর্ববৃহৎ ফোরাম জাতিসংঘের ভূমিকার একটি নিরেপেক্ষ মূল্যায়ন করা সম্ভব। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি এখনও অবহেলিত ও অনালোচিত রয়ে গেছে এবং বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া কিংবা বহির্বিশ্বে স্বতন্ত্রভাবে কোন গবেষণা হয় নি। ফলে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা জরুরি হয়ে পড়েছে।

অবশ্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতিসংঘের ভূমিকার বিষয়টি বিভিন্ন গ্রন্থে আংশিকভাবে এসেছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চারটি যেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে কলকাতা থেকে। সুবিমল মুর্খার্জী সম্পাদিত ***Bangla Desh and International Law*** গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকা কি হতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। লেখক মূলত বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকে জাতিসংঘ সনদের অবমাননা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১] যেহেতু গ্রন্থটি ১৯৭১ এর জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়, ফলে এতে জুলাই পরবর্তী ঘটনাসমূহের বিবরণ থাকা সম্ভব নয়। গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা এখানেই। দ্বিতীয় গ্রন্থটি অধ্যাপক কে, পি, মিশ্রের লেখা ***The Role of the United Nations in the Indo-Pakistan Conflict, 1971*** নয়াদিল্লী থেকে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।[২] এ গ্রন্থে ভারত ও

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের মধ্যে বৈরিতা অবসানের জন্যে ডিসেম্বরে নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদে বিতর্ক ও বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের মানবিক কার্যক্রম নিয়ে কোন বক্তব্য নেই।
এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, 'This books does not deal with the humanitarian contribution to the tragedy made by the world body..'[৩] দ্বিতীয়ত, মুজিবনগর সরকার কর্তৃক জাতিসংঘে প্রেরিত প্রতিনিধিদল এবং তাদের কর্মতৎপরতা নিয়ে কোন বক্তব্য নেই। তৃতীয়ত, গ্রন্থটির শিরোনামে অত্যন্ত সচেতনভাবে বাংলাদেশ শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানকে সামনে এনে বাংলাদেশকে প্রান্তে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সাধারণত, পাকিস্তানি গবেষকরা এই কাজটি করে থাকেন।

টমাস ওলিভার প্রণীত ***The United Nations in Bangladesh (1978)***[৪] গ্রন্থটি হচ্ছে এ বিষয়ে তৃতীয় প্রকাশনা এবং এটি বের হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি থেকে। ২৩৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে ১ থেকে ৯৯ পৃষ্ঠায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতে আশ্রিত বাঙালি শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকার কোন উল্লেখ নেই। এই গ্রন্থে রাজনৈতিক প্রশ্নে জাতিসংঘের তৎপরতার বিবরণও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ এ জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্টের অধস্তন কর্মকর্তা টমাস অলিভার সে সময় উথান্টের ব্যর্থতাসমূহকে আড়াল করতে চেয়েছেন। এবং নিক্সন প্রশাসনের সাথে উথান্ট যে পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছেন তার পক্ষে নানা যুক্তি উপস্থাপনও করেছেন।

চতুর্থ গ্রন্থটি বের হয়েছে ঢাকা থেকে ১৯৮৭ সালে। Nurul Momen প্রণীত ***Bangladesh in the United Nations : A Study of Diplomacy.***[৫] গ্রন্থটির মাত্র দু পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্বে জাতিসংঘের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংশিষ্ট বিষয়ে এই আলোচনা খুবই অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং এ কথা বলা যে, আলোচ্য চারটি গ্রন্থের সম্মিলিত বক্তব্যে জাতিসংঘ ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে ওঠে আসে নি। ফলে একটি পদ্ধতিগত গবেষণায় জাতিসংঘের ভূমিকা পরিস্ফুটনের প্রয়োজন রয়েছে। জাতিসংঘের ভূমিকার একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার অনিবার্য প্রশ্ন বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো ঃ

এক. দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশর মুক্তিসংগ্রামের একটি পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রশ্নে সমকালীন অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে তুলনা করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, এটি প্রকৃত অর্থেই একটি জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে তার স্বীকৃতির সমস্যাগুলো কি ছিল ? দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. তৃতীয় অধ্যায়ে থাকবে শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, বৃহৎ শক্তি, আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী ও ভারতের নানামুখী প্রতিক্রিয়ার বিবরণ ও বিশ্লেষণ। শরণার্থী প্রশ্নে ১৯৭১ সালে বাংলাদশ ইস্যু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সব সময়ই জীবন্ত থাকে এবং জাতিসংঘের সম্পৃক্তির মাধ্যমে একদিকে যেমন বিপর্যের হাত থেকে প্রায় এক কোটি মানুষ রক্ষা পায় আবার শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জাতিসংঘের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ভারতের হস্তক্ষেপ ক্রমশ যে অনিবার্য হয়ে ওঠে, তার বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ে খুঁজে পাওয়া যাবে।

তিন. ১৯৭১-এ ডিসেম্বর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে প্রকাশ্য আলোচনা খুব কমই হয়েছে, কিন্তু গোপন কূটনীতি পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। নিক্সন প্রশাসনের মূল কুশীলব হেনরী কিসিঞ্জার 'স্বীয় পছন্দমাফিক' একটি সমাধানে পৌঁছানের জন্যে বহুপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি মুজিবনগর সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের নেতা খন্দকার মোশতাক ও তার সমর্থকদের সাথে গোপন সমঝোতায় পৌঁছেন। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যাবে যে, তাজউদ্দিন কর্তৃক মোশতাকের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নেতা হিসেবে নিউইয়র্ক সফর বাতিল করে দেয়ায় পাকিস্তানের সাথে একটি শিথিল কনফেডারেশনের চিন্তা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

চার. পঞ্চম অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এখানে মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যে পরোক্ষভাবে সংঘটিত যোগাযোগের বিষয়টি দেখা যাবে। এই সম্পর্কের একটি ছিদ্রপথ প্রথম থেকেই উন্মুক্ত ছিল এবং পরে তা আরো প্রশস্ত হয়।

পাঁচ. বর্তমান গবেষণার সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো এটি। নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ ও ক্রমাগত বৈঠক এবং এসব বৈঠকে বৃহৎ শক্তিসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে নিরাপত্তা পরিষদে ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর পোল্যাণ্ডের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব নিয়ে বিদ্যমান বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে এবং গবেষণার ফসল তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হচ্ছে ইতিহাস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে গবেষকের বক্তব্যের সমর্থনে তা ব্যবহার করা। অবশ্য এ পদ্ধতির দুর্বলতা সচেতনভাবে পরিহার করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এজন্যে সাহায্য নেয়া হয়েছে অভিজ্ঞতাবাদী (Empirical)

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতির। এ পদ্ধতি অনুযায়ী একজন গবেষক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। বর্তমান গবেষণায় মূল দলিলপত্র, পত্রপত্রিকা, প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের পাশাপাশি বেশ কিছু সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে ঢাকায় জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) এর কর্মকর্তা জন. আর. কেলীর. দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। কেলী মানবিক বিষয়ে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ডিসেম্বরে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসর্ম্পনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থায় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১-এ ডিসেম্বরে বিজয়ী বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসার জবাব অনুসন্ধান করা হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে যারা জাতিসংঘে আগে থেকেই প্রচারণায় নিয়োজিত ছিলেন এবং যারা প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়েছিলেন তাদের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান গবেষণায় ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞতাবাদী উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় আন্তর্জাতিক আইনের চর্চা ও ব্যবহার (Practice) এর ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রার সূচনা করে। সি সি ওব্রাইয়েন (C.C. O`Brien) -এর ভাষ্য হলো "The most solidly founded assertion of the right to secede which has emerged after world war II".[৬] অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি একটি ন্যায় সঙ্গত ঘটনা ছিল। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্বে আন্তর্জাতিক আইনের দুটো প্রধান নীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। নীতি দুটো হলো ঃ

এক. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার (Self-determination) এবং মানবাধিকার (Human Rights) বিষয়ক নীতি;

দুই. রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতি (Territorial Integrity of State)

আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীর স্বধীনভাবে বেচেঁ থাকা ও তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার। জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলো আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার। আবার আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের অন্য নাম হলো গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার। মৌলিক মানবাধিকার হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রাথমিক পর্যায়। সভ্য সমাজে মানুষের মর্যাদা ও মূল্য নিয়ে বসবাসের অধিকারকে মানবাধিকার বলা হয়।[৭] ১৯৭১ সালে

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের দাবিকে নির্মমভাবে অবজ্ঞা ও অবদমন করে। ফলে সমগ্র বাংলায় একটি ভীতিকর পরিস্থিতির জন্ম হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা নজিরবিহীন গণহত্যায় মেতে ওঠে, শহর বন্দর ও জনপদ জ্বালিয়ে দেয়। নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন নেমে আসে এবং এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ও তার সেনাবাহিনীর যাবতীয় তৎপরতা জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিমালা যেমন মুখবন্ধ, ১(৩), ৫৫ ও ৫৬ ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। যেমন ধারা ৫৫ ও ৫৬ তে ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

ক. জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীকার সমূহ সংরক্ষণ ও সার্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা।

খ. ধারা ৫৫- তে বর্ণিত উদ্দেশ্যবলী কায়েম করার জন্যে সকল সদস্য রাষ্ট্র একক বা যৌথভাবে জাতিসংঘের সাথে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।[৮]

ষাটের দশকের শেষ দিকে জাতিসংঘ মানবাধিকারের প্রতি জোর দিতে থাকে। ১৯৬৮ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মানবাধিকার সংক্রান্ত চারটি প্রস্তাব পাস হয়।[৯] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যখন অচিন্ত্যিনীয় ও বর্বরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি সংঘটিত হয়, তখন জাতিসংঘ গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে হস্তক্ষেপ করতে পারতো। কিন্তু জাতিসংঘ তা করতে ব্যর্থ হয়, যদিও শরণার্থীদের সাহায্যে সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে। তদুপরি সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় ৩, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ ধারা লঙ্ঘনের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো।[১০] কিন্তু জাতিসংঘ বৃহৎ শক্তি বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম দেশগুলোর অনিহা ও বিরোধিতার কারণে ব্যর্থ হয়। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্যে পাকিস্তানকে সবসময়ই দোষারোপ করেছে।

অন্যদিকে সামরিক জান্তা পূর্ব বাংলায় গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অস্বীকার করে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে শুধু রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতি তুলে ধরেছিল। আন্তর্জাতিক আইনে এই নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতিসংঘ সনদের ধারা ২(৭) ও ২(৪)-এ এ নীতির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ২(৭)। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্র অপর কোন সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে

Dhaka University Institutional Repository

না ২(৪)।[১১] ফলে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা, তার পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক রাষ্ট্রসমূহ সনদের অন্যান্য ধারা লঙ্ঘনের বিষয়টি চেপে গিয়ে সব সময়ই এই নীতির কথাই জোরেশোরে প্রচার করেছে।

অবশ্য জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ যখন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তখন সনদের ২(৭) ও ২(৪) ধারা প্রযোজ্য হয় না।[১২] দেখা যায় যে, বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। তার কারণও এই গবেষণায় তুলে ধরা হবে। তবে মানবিক প্রশ্নে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করে এবং ভারতে বাঙালি শরনার্থীদের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংকট একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমান গবেষণায় দেখানো হবে যে, এই আন্তর্জাতিক ইস্যু সমাধানে জাতিসংঘের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ভারত হস্তক্ষেপ করে। এবং বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর হাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। দ্বিতীয়ত, বাঙালিরা ছিল সমগ্র পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশ। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালিদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং ঐ দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার সবকিছুই অস্বীকার করা হয়। ফলে বাঙালিরা আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার চর্চার জন্য স্বাধীনতা ঘোষনা করে। ১৯৭১ এর জুলাই মাসে এই সংগ্রামের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সুবিমল মুখার্জী লিখেছেন,

> It is a fight between democracy and militarism, between rights and repression, between human values and inhuman barbarities, between justice and tyranny, between self-determination and veil colonialism, between human dignity and slavery, and last, but not the least between racial equality and racial domination and superiority.[১৩]

অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের এই যুদ্ধ ছিল আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের লক্ষ্যে সত্যিকার জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। কিন্তু দেখা যাবে যে, জাতীয় সংহতি ও সমাকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে বিষয়টি যথাযথভাবে জাতিসংঘে প্রতিফলিত হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Subimal Kumar Mukhergee, ***Bangla Desh and International law*** (Calcutta : West Bengal Political Science Association, July, 1971)

২. K.P. Mishra, ***The Role of United Nations in the Indo-Pakistan Conflict, 1971*** (Delhi : Vikas Publishing House, 1973)

৩. *Ibid,* P. vi

৪. Tomas Oliver, ***The United Nations in Bangladesh*** (New Jersey : Princeton University Press, 1978)

৫. Nurul Momen : ***Bangladesh in the United Nations : A Study of Diplomacy*** (Dhaka : UPL, 1987)

৬. ***New York Times,*** 30 December 1971

৭. ***A Dictionary of Modern Politics*** (London : European Publication Limited, 1993) P. 190.

৮. *জাতিসংঘ সনদ,* (ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঃ ১৯৮৪) পৃঃ - ২৬

৯. ***General Assembly Resolution 2734 (XXV)*** December, 1970, Para 22

১০. *মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র* (ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঃ ১৯৯৮) পৃঃ ৭-১৩

১১. *জাতিসংঘ সনদ,* পূর্বোক্ত পৃঃ ৪

১২. ঐ,

১২. Subimal Kumar Mukhergee, ***Ibid,*** P.1,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি, স্বীকৃতি প্রশ্ন ও জাতিসংঘ

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটি পটভূমি আছে, আছে কিছু সুনির্দিষ্ট পর্যায়। একটি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। অনুপনিবেশিকীকরণ উত্তর পৃথিবীতে পাকিস্তানই একমাত্র রাষ্ট্র যেটি সশস্ত্র সংঘাতের মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঠেকিয়ে রাখতে যিনি প্রাণান্ত পরিশ্রম ও কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই হেনরী কিসিঞ্জারের কাছেও পরবর্তীকালে মনে হয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব ছিল অনিবার্য এবং এটা তিনি ১৯৭১ এর সংকটকালেই অনুভব করেছেন।[১] বর্তমান অধ্যায়ে কেন বাংলাদেশে অভ্যুদয় অনিবার্য ছিল তার একটি পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে যাতে জাতিসংঘের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সহজে বিশ্লেষণ করা যায়। একই সমান্তরালে কিছু আইনগত প্রশ্ন যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার যৌক্তিকতা, স্বীকৃতি প্রশ্নে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি

ভারতবর্ষ বিভক্তির পটভূমিতে সৃষ্ট ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্র বিজ্ঞানে একটি 'অভিনব রাষ্ট্র' হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। কারণ জাতীয় সংহতির বিভিন্ন সংযোজক উপাদান (Cementing ties) এর অভাবে এই রাষ্ট্রটি সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। দেশের দু'অংশের মধ্যে ছিল যোজন যোজন ব্যবধান। দৃশ্যত তা ছিল যেমন ভৌগোলিকভাবে, তেমনি অদৃশ্যভাবে তা ছিল জাতীয় ঐক্যে। নৃতাত্ত্বিক ভাষিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামগ্রিক জীবনধারায় পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ভিন্ন ছিল।[২] দেশের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে দুই হাজার কিলোমিটারের মত ব্যবধান ছিল। পাকিস্তানের এই কাঠামোগত স্ববিরোধীতার সমাধানে কোন কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করতে পাকিস্তানি শাসকরা আগ্রহী ছিল না এবং একই কারণে তারা ব্যর্থও হয়। তারা বাঙালিদের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ ও বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রত্যয়সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি। দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রের প্রভাবে পঞ্চাশের দশকে যে ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক শাসন চালু ছিল সেখানে বাঙালিদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ষাটের দশকে সামরিক শাসনামলে বাঙালিদের ভোটের অধিকারও কেড়ে নেয়া হয়। ভাষা ও সংস্কৃতির উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করা হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রুততর উন্নতি ও কাঠামোগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্থায়ী রূপ দান করে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল।[৪] ধ্রুপদি সাম্রাজ্যবাদের সাথে এই নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদের অনেক মিল পরিলক্ষিত হয়।[৫] এই অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন দুটো কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়।

এক. মৌলিক কাঠামোতে (Basic structure) অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ ;

দুই. উপরি কাঠামোতে (Super structure) অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ।

বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভারত বিভক্তিকালে পাকিস্তানের দুই অংশ যে অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয়, তাতে তাদের বিকাশের স্তরে কোন তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য ছিল না।[৬] উভয় অংশের জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) প্রায় সমান ছিল।[৭] কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হয় এবং ষাটের দশকেও তা অব্যাহত থাকে। ফলে ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-১৯৭০ এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জিডিপি পূর্বাংশের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে এবং দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। ষাটের দশকে দু'অংশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে পূর্বাংশে ৪.৩% এবং পশ্চিমে ৬.৪%।[৮] অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে লিখেছেন, তার সারাংশ হলো, ১৯৫৫-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানির অংশ ছিল ৩৮.৬% এবং রফতানির বাদবাকী ৬১.৪% হতো পূর্ববাংলা থেকে।[৯] বৈষম্যের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে সারণি ২.১ ও ২.২ এ।

সারণি-২.১

পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য ১৯৫৮-৬৮

পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব পাকিস্তান	
রফতানি	আমদানি	রফতানি	আমদানি
৮২ কোটি পাউন্ড	২৩১ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড	১১৫ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড	১০০ কোটি পাউন্ড
৪১%	৭০%	৫৯%	৩০%

উৎস : ***Bangla Desh Documents*** (Delhi : Ministry of External Affairs, Government of India, 1971) PP.15-22.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ২.২

পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর

(১০ লক্ষ টাকার হিসাবে)

	বিষয়	১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬০-৬১	১৯৬১/৬২ থেকে ১৯৬৮-৬৯	১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯
১.	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্য	৪৮৪০	১৪৪৯০	১৯৩৩০
২.	জনসংখ্যার অনুপাতে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য হিস্যা	৮৪৩০	২৬৭১০	৩৫১৪০
৩.	পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য স্থানান্তর (২-১)	+ ৩৫৯০	+ ১২২২০	+ ১৫৮১০
৪.	পূর্ব পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট	+ ৫৩৭০	- ৯৩৯০	- ৪০২০
৫.	পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর (৩+৪)	+ ৪৯৬০	+ ২৮৩০	+ ১১৭৯০

উৎস ঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনীতিবিদরে প্যানেলের রিপোর্ট।

সারণি ২.১ এর চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের মোট রফতানি থেকে যে অর্থ আসতো তাতে পূর্ববাংলার অবদান ছিল অনেক বেশী। এই মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো পাকিস্তানের প্রধান রফতানি দ্রব্য পাট থেকে।

পূর্ববাংলা থেকে সম্পদ দু'ভাবে পাকিস্তানে পাচার হতো। প্রথমত, পূর্ববাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প গড়ে ওঠতো। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হতো পূর্ববাংলা। সারণি- ২.২ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কীভাবে পূর্বাংশ থেকে পশ্চিমাংশে সম্পদের স্থানান্তর হচ্ছে। এর সাথে যদি পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়া পূর্ববাংলার প্রাপ্য বৈদেশিক সাহায্যের অংশকে যোগ করা হয় তখন পূর্বাংশ থেকে পশ্চিমে সম্পদ স্থানান্তরের ব্যাপকতা পরিমাপ করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক শোষণকে পোক্ত করা হয়েছিল অন্যান্য কতকগুলো উপায়ে। যেমন দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। অস্ত্র কারখানাগুলোও ছিল সেখানে। দেশরক্ষা বাহিনীর চাকুরীও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া দখলে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেটের ৫৬% প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হয় এবং এর মাত্র ১০% পূর্ব বাংলায় ব্যয় করা হয়।[১০] অথচ অধিকাংশ কর প্রদান করতো পূর্ববাংলা। সারণি ২.৩ -এ এই বৈষম্যের একটি পুরো চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

সারণি - ২.৩

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে পূর্ববাংলার অংশগ্রহণ

সেনাবাহিনী

পদ	কোটা	বাস্তবে চাকুরীরত
অফিসার	কোন কোটা বরাদ্দ নেই	৫%
জুনিয়র কমিশন অফিসার	৭.৮%	৭.৪%
সৈনিক	৭.৮%	৭.৪%

বিমান বাহিনী

অফিসার	---	১৬%
ওয়ারেন্ট অফিসার	---	১৭%
অন্যান্য পদে	---	৩০%

নৌবাহিনী

অফিসার	---	১০%
শাখা অফিসার	---	৫%
প্রধান পেটি অফিসার	---	১০.৪%
পেটি অফিসার	---	১৭.৩%

সূত্র : ১. ***Dawn*** (Karachi) January 8, 1996

২. ***Pakistan National Assembly Debates,*** 8 March 1963, PP. 29-31

এরপর রয়েছে প্রশাসনিক বঞ্চনার ইতিহাস। এখানেও বাঙালিরা তাদের ন্যায়সঙ্গত হিসাব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সারণি - ২.৪ থেকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ২.৪

সিভিল সার্ভিসে পূর্ববাংলার অংশ

বছর	সার্ভিসের নাম	পূর্ববাংলার অফিসার	পশ্চিম পাকিস্তানের
১৯৬৮	পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস	১৮৬	৩২৬
১৯৬৭	পাকিস্তান আয়কর সার্ভিস	৮৬	১৪১
১৯৬৭	পাকিস্তান অডিট এন্ড একাউন্টস	৪৪	৯৫
১৯৬৭	পুলিশ	৮২	১২৮
১৯৬৭	কেন্দ্রীয় তথ্য সার্ভিস	১৯	৪৯

সূত্র ঃ ***Pakistan Observer,*** 19 June, 1968.

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র ছিল আরো ভয়াবহ। সারণি ২.৫ বিশ্লেষণ করলে এই বৈষম্যের প্রকৃতি স্পষ্ট হবে।

সারণি - ২.৫

শিক্ষাখাতে বৈষম্য

ক্ষেত্র	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ববাংলা
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪৭-৪৮ ১৯৬৮-৬৯ ৮, ৪১৩ ৩৯, ৪১৮ সাড়ে চারগুণ হারে বৃদ্ধি	১৯৪৭-৪৮ ১৯৬৮-৬৯ ২৯৬৬৩ ২৮,৩০৮ যদিও শিশুদের সংখ্যা বেড়েছে তবুও সংখ্যায় কমেছে
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৫৯৮ ৪৪৭২ ১৭৬% বৃদ্ধি	৩,৪৮১ ৩,৯৬৪ ১৪% বৃদ্ধি
বিভিন্ন ধরনের কলেজ	৪০ ২৭১টি ৬৭৫% বৃদ্ধি	৫০ ১৬২ ৩২০% বৃদ্ধি
মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৪টি ১৭টি ৪২৫% বৃদ্ধি	৩ ৯টি ৩০০% বৃদ্ধি
বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা	২টা ৬টা ৬৫৪ জন ১৮৭০৮ জন ৩০ গুণ বৃদ্ধি	১ --- ৪টা ১৬২০ ৮৮৩১ পাঁচ গুণ বৃদ্ধি

সূত্র ঃ Bangla Desh Documents, Ibid, P.19

Dhaka University Institutional Repository

উপরে সারণি এবং উপাত্তগুলো প্রমাণ করে যে, পূর্ববাংলার সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামোর শিকার হয়েছিল। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোও সত্তর দশকের সূচনাপর্বে পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের নিন্দা জানান এবং এই প্রক্রিয়াকে 'অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামো' (Internal colonial structure) বলে অভিহিত করেন।[১১]

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি প্রবল দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগের কোন সাধারণ ভাষা (Linga Franca) ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানে অপরিচিত ছিল। অন্যদিকে পূর্ববাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট শ্রেণীর ভাষা উর্দুতে কথা বলতো খুবই নগণ্য সংখ্যক মানুষ (সারণি ২.৬ দ্রষ্টব্য)

সারণি - ২.৬

পাকিস্তানের উভয় অংশে ভাষিক চিত্র

ভাষা	পূর্ব	পশ্চিম	মোট
বাংলা	৯৮.৪২%	০.১২%	৫৬%
পাঞ্জাবী	০.০২%	৬৬.৩৯%	২৯%
উর্দু	০.৬১%	৭.৫৭%	৩.৬৫%

সূত্র ঃ ***Pakistan Statistical Year Book 1969.***

তদুপরি বাঙালিদের ভাষা ও সংস্কৃতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে উন্নত ছিল। রওনক জাহান, এই অবস্থার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে "The Bengali are intensely attched and proud of their language and often reveal a sense of linguistic nationalism."[১২] কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উর্দুকে বাংলার বদলে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলেন, তখন বাঙালি ছাত্ররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা অন্যতম রাষ্টভাষা হলেও ততদিনে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ অনেকদূর এগিয়ে যায়। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে রোমান হরফে বাংলা লেখার জন্য 'ভাষা সংস্কার কমিটি' গঠন করেন।[১৩] এবং এর অব্যবহিত পরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনে বাধা দেন। আরো ছয় বছর পর ১৯৬৭ সালে বেতারে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। সামরিক স্বেচ্ছাচারী আইয়ুবের এই উদ্যোগ বাঙালিদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙ্গে যায়।[১৪] কিন্তু উভয় অংশের মধ্যে এই নিরন্তর সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বিচ্ছিন্নতার পটভূমিকে ক্রমশ অনিবার্য করে তুলে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের ইতিহাসে সমগ্র সময়টাতে বাঙালিদের ভূমিকা পালন করতে দেয়া হতো না। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস প্রেসিডেন্ট, অর্থমন্ত্রী, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রধান পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। ফলে বাঙালিরা জাতীয় ক্ষমতা থেকে তাদেরকে বাইরে রাখার ব্যাপারটিকে আঞ্চলিক বৈষম্যের সাথে এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্র কর্তৃক একচেটিয়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করে।[১৫]

একটি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল জাতীয় ক্ষমতায় হিস্যা লাভকল্পে বাঙালিদের পরিকল্পিত সংগ্রামের অংশ, কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন প্রত্যাবর্তনের ফলে সংবিধানে প্রদেশগুলোকে কর্তৃত্ব না দিয়ে প্রধানত প্রধান নির্বাহী ও কেন্দ্রের হাতে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন ও প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার হরণ বাঙালিদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, তারা জাতীয় ক্ষমতায় নায্য হিস্যা কখনই পাবে না। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ববাংলা নিরাপত্তাহীনতা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে বাঙালিদের সার্বিক মুক্তি ও পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উথাপন করেন।[১৬] কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরা ও সরকার ছয় দফার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৬ দফার বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলকে বিভেদকারী বলে অভিহিত করেন এবং তাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ ও যুদ্ধের হুমকি প্রদান করেন।[১৭] এরপর ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়। জনগণের তীব্র আন্দোলনের মুখে এই মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং ১৯৬৯ -এর প্রথমদিকে গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের সরকারের পতন ঘটে।[১৮] ক্ষমতায় আসেন জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। তিনি এসেই দেশে-বিদেশে প্রচার করতে লাগলেন যে, অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ব্যারাকে প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য।[১৯]

ক্ষমতা গ্রহণের অল্পকাল পরেই ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘের সামনেও একটি 'পবিত্র প্রতিশ্রুতি' দিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১২৭টি দেশের প্রতিনিধিরর সামনে ঘোষণা করেন, "অবিলম্বেই পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে আমি বদ্ধপরিকর।"[২০] ১৯৭০ সালে শেষদিকে নির্বাচন অনুষ্ঠানও হয়েছিল, কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রত্যাশিত ছিল। তারা বাঙালিদের কখনই কেন্দ্রে ক্ষমতায় দেখতে চায়নি। এ কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফল নস্যাতের জন্য সামরিক সমাধান বেছে নেয়। ভুট্টোকে দিয়ে একটি প্রেক্ষাপট তৈরী করানো হয়।[২১] লারকানা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া খান 'Two Majority Party' তত্ত্ব হাজির করেন। ১৭ জানুয়ারী লারকানায় ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, "The people have given their decision in favour of two majority parties."[২২] ভুট্টো কেবল ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতেই অস্বীকার করেননি তিনি ক্ষমতায় অংশীদারিদের প্রস্তাবও করে বসেন। এটি হলো পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং ইয়াহিয়া খান হবেন সম্পূর্ণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।[২৩] জেনারেলগণও এই পরিকল্পনার জন্যে কাজ করতে থাকে। ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের (National Security Council) চেয়ারম্যান লেঃ জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে বহু পাকিস্তানি জাতীয় পরিষদ সদস্যকে ঢাকা আসতে নিষেধ করেন।[২৪] তবুও অনেক পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান লারকানা পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। বাঙালিরা তখন শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন। পূর্ববাংলায় বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ কর্তৃত্বে প্রকৃতপক্ষে তারই শাসন চলতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনা হয়। প্রায় ১০ দিন ব্যাপী আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু ফলাফল হয় শূন্য। এই ফাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য মোতায়েনের কাজটিও সম্পন্ন হয়। মার্চের ২৫ তারিখ সকালে দেখা গেল ইয়াহিয়া উপদেষ্টা না জানিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। ২৫ তারিখ রাতে নিহতের ঢল ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ইয়াহিয়া ১৯৭০ এর অক্টোবরে জাতিসংঘের সামনে যে 'পবিত্র প্রতিশ্রুতি' দিয়েছিলেন সেটি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক বহরের নিচে পিষ্ঠ ও ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই উদ্ভবের পটভূমি অতিসংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতা থেকে তৈরী হয়েছে ১৯৭১ -এর মার্চ মাসের অসহযোগ প্রতিরোধ উদ্ভূত অনিবার্যতা, যে অনিবার্যতা তৈরী করেছে মুক্তিযুদ্ধের অপ্রতিরোধ্যতা এবং একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কার্যক্রম।"[২৫]

১৯৭১ -এ পূর্ববাংলায় ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে বলে ভারত জাতিসংঘে অভিযোগ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের শিকার বিভিন্ন দেশ ও জনগণকে স্বাধীনতা প্রদান সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ কমিটির সভায় কৃষ্ণ মেনন বলেন যে, মোজাম্বিক ও অন্যান্য ঔপনিবেশের মত বাংলাদেশও ঔপনিবেশিক শাসনের শিকার, তাই জাতিসংঘের উচিত হস্তক্ষেপ করা। প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানি প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আগাশাহী

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, পাকিস্তান পূর্ববাংলাকে জোর করে পাকিস্তানের অংশে পরিণত করেনি।[২৬] অবশ্য পূর্ববাংলা পাকিস্তানের ঔপনিবেশ কীনা এই প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

স্বীকৃতি প্রশ্ন ও জাতিসংঘ

১৯৭১ -এ মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ এপ্রিল গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এই সরকারের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর মহকুমার মুজিবনগরে (বৈদ্যনাথ তলা) শপথ গ্রহণ করে এবং মুজিবনগর সরকার (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। মুজিবনগর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনগণ ও রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি আদায়। ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpes... We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood."[২৭] নয় মাসব্যাপী কর্মকাণ্ডের মধ্যে মুজিবনগর সরকার সব সময়ই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কর্মতৎপর ছিল। বস্তুত, বৈরী পরিবেশে এটি ছিল অন্যরকম যুদ্ধ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানী থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবন পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে স্বীকৃতি ও সহানুভূতি আদায়ের সংগ্রাম বিস্তৃত হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন উঠে স্বীকৃতি বলতে কি বুঝায় এবং আইনে এর গুরুত্ব কতটুকু ? আন্তর্জাতিক সমাজে যখন একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে তখনই স্বীকৃতির প্রশ্ন উঠে। আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি একটি ব্যাপক ধারণা। এটি কেবল একটি আইনগত বিষয় নয় বরং এর সাথে রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রবলভাবে জড়িয়ে আছে। এর একটি কারণ হচ্ছে যে, " A state is a historical and political fact, the creator rather than a creature of law." অধ্যাপক G.J. Starke এর মতে, " The subject is one of some difficulty and at the stage of development of international law, can be presented less as a collection of clearly defined rules or principles than as a body of fluid, inconsistent and unsystematic state practice". অধ্যাপক Starke তার পূর্বসুরি আইনবিদ L. Oppenheim এবং ফরাসী আইনবিদ J. Chapentier প্রমুখের মতামত বিশ্লেষণ করে স্বীকৃতি বিষয়টিকে কতগুলো শ্রেণীভুক্ত করেছেন যেমন ; (ক) নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি; (খ) নতুন সরকারকে স্বীকৃতি; (গ) জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে স্বীকৃতি; (ঘ) কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক রাজনীতিকে স্বীকৃতি; (ঙ) যুদ্ধমান অথবা বিদ্রোহী সরকারকে স্বীকৃতি।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

আইনে স্বীকৃতি সংক্রান্ত দুটি প্রধান তত্ত্ব রয়েছে, (ক) ঘোষণামূলক স্বীকৃতি (Declaratory theory of recognition) এবং (খ) গঠনতান্ত্রিক স্বীকৃতি (Constitute theory of recognition). আন্তর্জাতিক আইনে ঘোষণামূলক স্বীকৃতির অপর নাম কার্যত স্বীকৃতি। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে যদি কোন সরকার বা রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে তখন স্বীকৃতি বিষয়ে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেই চলে। পক্ষান্তরে গঠনতান্ত্রিক স্বীকৃতির প্রবক্তারা আইনগত বৈধতার উপর বেশি জোর দেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র শুধু স্বীকৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করতে পারে।

তবে আন্তর্জাতিক আইনের অধিকাংশ সমকালীন লেখক স্বীকৃতির প্রশ্নে ঘোষণামূলক মতবাদের উপর বেশি জোর দেন।[২৯] অবশ্য তারা এও মনে করেন যে, চূড়ান্ত স্বীকৃতি তখনই দেওয়া যায় যখন কোন রাষ্ট্র, রাষ্ট্র গঠনের পূর্ণ শর্তগুলো পূরণ করে, (অর্থাৎ ভূখণ্ড, জনবল, সরকার ও সার্বভৌমত্ব)।[৩০]

প্রাথমিকভাবে দেখা যায় যে বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো থেকে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে কারণে State Structure- এর দিক থেকে এটি একটি গৃহযুদ্ধ ছিল। Oppenheim এর মতে, "The law of Nations does not treat civil war as illegal."[৩১] এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রথমদিকে মুজিবনগর সরকার একটি যুদ্ধমান সরকার বা belligerent government ছিল। এ ধরনের একটি সরকার গঠনের কতগুলো শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো ঃ (১) বিদ্রোহীগণ কর্তৃক তাদের অঞ্চলে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সমর্থ হতে হবে, (২) বিদ্রোহীগণ কর্তৃক তাদের দখলকৃত এলাকায় অবশ্যই তাদের শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল সরকার গঠন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে; (৩) কোন সুনির্দিষ্ট এলাকার উপর পূর্ণ দখল বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; (৪) অবশ্যই একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে; (৫) তাদের অধিকৃত এলাকায় বৈধ কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হতে হবে এবং অন্যান্য দেশের সার্বভৌম সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।[৩২]

মুজিবনগর সরকার এসব শর্তাবলী সিংহভাগ পূরণ করে। এ সরকার সবসময় কিছু এলাকা শাসন করে। যেমন- হিলি, রৌমারি ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত; এটি একটি কার্যকরী (Effective) সরকার ছিল। এর একটি প্রশাসন যন্ত্র এবং সচিবালয় ছিল। যেমন ২ জুলাই মুজিবনগর সরকার ৯টি প্রশাসনিক জোন প্রতিষ্ঠা করে।[৩৩] সরকারের সেনাবাহিনী ছিল, বিদেশে কূটনৈতিক মিশন ছিল, একটি রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল এবং সেখান থেকে কর্মচারীদের বেতন দেয়া হত। ১৮ জুন মুজিবনগর সরকারের অর্থসচিব কে, এ, জামান জোনাল প্রকাশকদের কাছে লেখা পত্রে চাকুরীরতদের সরকারী বেতন স্কেল অনুযায়ী অর্থ পরিশোধের নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

দেন।[৩৪] এর একটি প্রচার যন্ত্রও ছিল-যেমন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধি এ, এম, এ মুহিতের মতে, "In every point of view it was an effective govt."[৩৫] ফলে যুদ্ধমান সরকারের স্বীকৃতিলাভ মুজিবনগর সরকার অবশ্যই দাবি করতে পারতো।

দ্বিতীয়ত ঃ পুরানো একটি রাষ্ট্রে বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ অথবা অন্য কোন কারণে নতুন সরকারের অভ্যুদয় হলে কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক আইনবিদ Lauterpacht এ প্রসঙ্গে চারটি শর্তের কথা বলেছেন। এগুলো হল (ক) ঐ রাষ্ট্রের জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য অর্জন; (খ) সরকারের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব; (গ) সরকারের কার্যকারিতা (Effectiveness); (ঘ) আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা ও নিশ্চয়তা প্রদান।[৩৬]

মুজিবনগর সরকার এর সবগুলো শর্তই পূরণ করেছিল। প্রথমত, আমরা দেখি যে এটি শুধু একটি দলীয় সরকার নয় বরং একটি সর্বদলীয় সরকার ছিল। ২০ শে এপ্রিল ন্যাপ (মোজাফ্ফর) নেতা অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ[৩৭] এবং ২১ শে এপ্রিল মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আবেদন জানান। ভাসানী জাতিসংঘ-মহাসচিব, প্রেসিডেন্ট নিক্সন, চেয়ারম্যান মাওসেতুং, প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, আরবলীগের মহাসচিবসহ বিশ্বের ১২ জন প্রথম সারির নেতাদের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানান।[৩৮]

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সরকারের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব প্রশ্নে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির আবির্ভাব পর্যন্ত এ সরকারের প্রতিটি সদস্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল।

তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে Effectiveness যেখানে দেখা হয় যে একটি সরকার কার্যকর হবে অথবা হবে না। মুজিবনগর সরকার যে একটি কার্যকরী সরকার ছিল এ সম্পর্কে এ, এম, এ, মুহিত কার্যকর সরকারের যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে বিশ্বব্যাংক একটি রিপোর্টে দখলীকৃত বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ রকম অস্থিতিশীল হিসেবে বর্ণনা করে। সে সময়ের বিদেশী পত্রপত্রিকা এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বড় শহর এবং ক্যান্টনমেন্টগুলো ছাড়া দখলীকৃত বাংলাদেশে সামরিক জান্তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যুদ্ধরত বাংলাদেশের আশি শতাংশ ভূমি মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। Effectiveness সম্পর্কে Oppenheim মন্তব্য করেছেন যে 'জনপ্রিয় অনুমোদন' যা সাধারণত নির্বাচনের রায়ে প্রকাশ পায়। এ ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। কারণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনী রায় অনুযায়ী শেখ মুজিবুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমানের সরকারই সমগ্র পাকিস্তানের বৈধ সরকার। কিন্তু এ বৈধ কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া গণহত্যা ও নির্যাতনের পথ অনুসরণ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তাই 'জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' হিসেবে অভিহিত করা যায়। কিন্তু যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখনও 'জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়নি। আন্তর্জাতিক আইনে এ ধরনের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চার বছর পরে ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম আরবলীগ ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধি হিসেবে পি.এল.ও কে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীকালে জাতিসংঘ পি.এল.ও কে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে SWAPO কে (South West African Peoples Organization) নামিবিয়ার জনগণের একমাত্র ও বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ ধরনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশগুলো জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পর্যবেক্ষক বা অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা লাভ করে।[৩৯]

SWAPO, PLO এবং মুজিবনগর সরকারের প্রকৃতি একই। প্রথম দুটো কয়েক দশক ব্যাপী স্বাধীনতার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পক্ষান্তরে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা অর্জন করে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক কারণও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানঘেঁষা নীতি অনুসরণ করে এবং পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য জাতিসংঘকে ব্যবহার করে।[৪০] চীনও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিধাহীনভাবে অনুসরণ করে। সর্বোপরি International Power Politics এর কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

বাংলাদেশ ও বায়াফ্রা ঃ একটি ভ্রান্ত তুলনা ?

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে তুলনা করেন।[৪১] কিন্তু দুটি সংগ্রামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিরা বিশ্ববাসী ও জাতিসংঘের সামনে এ পার্থক্য তুলে ধরেন। এসব পার্থক্যগুলো হল ঃ

ক) বায়াফ্রা হলো নাইজেরিয়া ফেডারেশনের সন্নিহিত অঞ্চল। অন্যদিকে বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে ছিল পাকিস্তানের একটি দূরবর্তী অঞ্চল। এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের দূরত্ব ছিল প্রায় ১২শ মাইল। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন সমুদ্র ও আকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পথে এ দূরত্ব ৩০০০ মাইলে দাঁড়ায়। কারণ ভারত তার আকাশ ও নৌপথে পাকিস্তানের সামরিক সরঞ্জামাদি পরিবহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

(খ) বাংলাদেশ আন্দোলন ছিল একটি সত্যিকার জাতীয় আন্দোলন ও একটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।[৪২] বাঙালিরা ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তথাপি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্যে বাঙালিদের দাবি ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ১৯৫৪, ১৯৫৮ ও ১৯৭১ সালে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালের মার্চে যখন শেষবারের মত নির্বাচনী রায়কে অস্বীকার করে তখনই বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। অন্যদিকে ইবোদের সংগ্রাম ছিল পুরোটাই সামরিক বিষয়। সেখানে একজিন সামরিক অফিসার কর্নেল ওজুকু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় একটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, যে দলটি সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। বাঙালিরা তাই জাতিগত নিপীড়ন ও অবৈধ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিচার ব্যবস্থায়ও ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন অবৈধ ঘোষণা করা হয়। যেমন ইউসুফ প্যাটেল বনাম রাষ্ট্র মামলার বিচারপতি হামদুর রহমান ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

(গ) বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোন অর্থেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না। কারণ বাঙালিরা ছিল গোটা পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৫%। অন্যদিকে বায়াফ্রার শুধু ইবো গোত্রের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। ইবোরা সংখ্যায় ছিল নাইজেরিয়া ফেডারেশনের একটি ক্ষুদ্র অংশ। কাজেই সাধারণ যুক্তিতে দেখা যায় যে, একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যখন ন্যায়সঙ্গত কারণে পৃথক হবার ইচ্ছা পোষণ করে, কখন তা মেনে নেয়াই উচিত। কিন্তু তা না করে সামরিক শাসকরা সশস্ত্র পদ্ধতিতে তাদের দমন করতে চায়। ফলে বাঙালিদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না।

(ঘ) কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানি দূতাবাসগুলো থেকে রাষ্ট্রদূতসহ অনেক বাঙালি কূটনৈতিক প্রকাশ্যে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে। পৃথিবীর অন্য কোন মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে এরকম নজির দেখা যায়নি। সাধারণত দেখা যায় যে, কূটনৈতিকরা হচ্ছেন খুব হিসেবী মানুষ এবং তারা যে

Dhaka University Institutional Repository

কোন সংগ্রামে সর্বশেষে যোগদান করেন। The Manchester Guardian মন্তব্য করেছিল যে, "বুঝতে হবে এরকম যখন ঘটছে, তখন শেষ রক্ষা নেই।"[৪৩]

বাংলাদেশ কতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছিল ?

১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকরা পাকিস্তানকে কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নেন।[৪৪] এ উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুজিবনগর সরকারের পক্ষে সরাসরি স্বীকৃতি আদায় খুব একটা সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্বব্যাপী একটি প্রবল জনমত সৃষ্টি হয় যা এ.এম.এ মুহিতের ভাষ্য অনুসারে আন্তর্জাতিক অভিমত সৃষ্টি করে।[৪৫] যে প্রবল আন্তর্জাতিক জনমত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ১৯৭১ সালে একটি প্রধান আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করে তা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবুও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রশ্নে কিছু নিদর্শন তুলে ধরা প্রয়োজন।

মে মাসে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি আব্দুস সামাদ আজাদ বুদাপেষ্টে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক ফোরাম যারা প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়।[৪৬]

১৬ জুন ১৯৭১ ব্রিটেনের শ্রমিক দলের ১২০ জন এ.পি. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য একযোগে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। এর আগে জুনের ২য় সপ্তাহে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যগণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রশ্নে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। ঐ বিবৃতিতে তারা বলেছিলেন, "Until order is restored under U.N. supervision, the provisional government of Bangladesh should be reconized a vechicle for expression of self determination by the people of East Bengal."[৪৭]

অন্যদিকে কিছুটা বিলম্ব হলেও যুক্তরাষ্ট্র রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান এন. ম্যাকক্লসকি ৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন যে, "একটি নতুন জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।"[৪৮] কিন্তু সরকারি পর্যায়ে মার্কিন নীতিতে পাকিস্তান ঘেঁষা প্রবণতা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। নিক্সন ও কিসিঞ্জার ভূ-রাজনীতি দ্বারা বেশি তাড়িত হয়েছিলেন।[৪৯] সুতরাং ওয়াশিংটনে বাঙালি কূটনীতিকরা মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের অনেক কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেও ভূ-রাজনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র সেদিন মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।[৫০]

অপর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল এবং পাকিস্তানি জান্তার গণহত্যার নিন্দে করলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর অংশ হিসাবে সমস্যার সমাধানের কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলে।[৫১] কিন্তু রুশ ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ক্রমশঃ রুশ নীতিতে বাংলাদেশপন্থী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ৭ অক্টোবর মস্কো পূর্ব পাকিস্তানের জায়গায় বলল 'পূর্ব বাংলা'। নভেম্বর মাসের শুরুতে মস্কো পরিষ্কার ভাষায় বলল, এটি একটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।[৫২] অর্থাৎ অক্টোবরে দ্বিধামুক্তির পর থেকেই মুজিবনগর সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি Defacto সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভাবিত পূর্ব ইউরোপ একই ধরনের Defacto স্বীকৃতি দেয়। আব্দুস সামাদ আজাদের বুদাপেষ্ট সম্মেলনে যোগদান হচ্ছে এর একটি প্রমাণ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সমর্থক ভারত তার জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টিকে বিলম্বিত করেছিল। ভারতের একটি মহলের ধারণা ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের সাথে যোগ দেবে এবং তামিলনাড়ু, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।[৫৩] কিন্তু সারা ভারত জুড়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্নে একটি প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। ৫ মে ভারতের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন *বাংলাদেশে জাতীয় সমন্বয় কমিটি* বাংলাদেশ *স্বীকৃতি দিবস* পালনের ডাক দেয়। ঐদিন বিকালে কলকাতা শহীদ মিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক হরিপদ ভরতী বলেন, "এতদিন ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রশ্নে নীরব থেকে প্রকারন্তরে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীকে সমর্থন জানাচ্ছেন।"[৫৪] ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকা, রাজনৈতিক দল তথা সর্বস্তরের জনগণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্যে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাতে থাকে। যেমন *আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩ এপ্রিল এবং *যুগান্তর* ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এদিকে ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করেন, "I request your excellencys government to accord immediate recognition to the peoples republic of Bangla Desh".[৫৫]

৭ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহবান জানানো হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রী অজয় মুখার্জী এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করেন বিরোধী দলীয় নেতা শ্রী জ্যোতি বসু।[৫৬] ভারতীয় লোকসভায় ১৮ জুন কর্নাটকের সাংসদ শ্রী সমর গুহ বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতিদানের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সরকারি দল কংগ্রেস বিরোধিতা করে।[৫৭] বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি (Dejure) প্রদানের জন্য ভারতব্যাপী যে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হয় তা প্রশমনের জন্য ভারত সরকারের সে সময়ের তথ্য কর্মকর্তা বি.এল. শর্মা মে মাসের শুরুতে সংবাদপত্রে এক নিবন্ধে বলেন, ভারত সরকার পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি এড়িয়ে চলার জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আইনের দৃষ্টিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বলেন, "ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে তা হবে ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার মত রাজনৈতিক স্বীকৃতি।" বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি কখনও সম্ভব ছিল না। কারণঃ (১) যুদ্ধের সরাসরি সম্ভাবনা; (২) এতে পাকিস্তান বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে তুলতে চাইবে এবং কাশ্মীর প্রশ্নটি পুনরায় আলোচনায় চলে আসবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভারত নিরাপত্তা পরিষদে তেমন কোন সমর্থন পাবে না; (৩) মুসলিম দেশগুলোর সহানুভূতি পাকিস্তানের সমর্থনের পক্ষে চলে যেত।[৫৮]

অবশ্য ভারত সরকার প্রথম দিকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও মুজিবনগর সরকার গঠনের পর থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে এক ধরনের কার্যত বা Defacto স্বীকৃতি প্রদান করে। যেমন মঈদুল হাসান ডিপি ধরকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, এপ্রিল মাসে ভারত সরকার দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে- যথা ঃ (১) ভারতের সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়া ; (২) বাংলাদেশ সরকারকে ভারতীয় এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অধিকার প্রদান।[৫৯]

২২ মে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের জনগণকে ভারত সাহায্য দিয়ে যাবে।[৬০] ১৭ অক্টোবর জলন্ধরে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম মন্তব্য করেন যে, "যত সময় অতিবাহিত হবে মুক্তিবাহিনীর ততই অগ্রগতি হবে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে।"[৬১] ১৫ নভেম্বর মার্কিন সাময়িকী ***Newsweek*** এর সাথে এক সাক্ষাৎকালে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অনিবার্য অভ্যুদয়ের কথা বলেন।

অন্যদিকে বাস্তব ক্ষেত্রে ভারত কতগুলো পদক্ষেপ নেয় যার মাধ্যমে সে দেশ মুজিবনগর সরকারকে একধরনের Defacto স্বীকৃতি প্রদান করে। যেমন বিদেশ ভ্রমণকারী মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদের জন্য ভারত সরকার Travel Certificate প্রদান করতো। দ্বিতীয়ত, ভারত সরকার প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে একজন করে লিয়াঁজো অফিসার নিযুক্ত করেন। মুজিবনগর সরকারকে রফতানির জন্য ভারত সরকার কলকাতা বন্দর ব্যবহার করতে দিয়েছিল।[৬২] সুতরাং ভারত সরকারের বিভিন্ন বক্তব্য ও পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষয়টিকে তারা পর্যায়ক্রমিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানে ইচ্ছুক ছিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তারা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভারতীয় লোকসভায় (৬ ডিসেম্বর) ইন্দিরা গান্ধী তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি ঘোষণা করেন।[৬৩] ভারতকে অনুসরণ করে ভুটান এবং ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ৮০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। Henry Kissinger, ***The White House Years*** (Delhi: Vikas Publishing House, 1979) PP. 852-53.

২। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রখ্যাত মার্কিন লেখক Hans. J. Morgenthu পাকিস্তানের দু' অংশের বৈপরিত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ১৯৫৬ সালে লিখেছেন, "Pakistan is not a nation and hardly a state. If has no justification in history, ethnic origin, language, civilization or the consciousness of those who makes up its population" দেখুন Hans J. Morenthu "Military Illusions" in ***The New Republic,*** Washington D.C March 1956, P.14. মাওলানা আবুল কালাম আজাদও এই সমস্যার দিকটি তুলে ধরেছেন। দেখুন A.K. Azad. ***India Wins Freedom*** (Bomby : Orient Longmum, 1959) P. 227

৩। রেহমান সোবহান, "বাঙালী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি", সিরাজুল ইসলাম(সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ২য় খণ্ড (ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি , ১৯৯৩) পৃষ্ঠা-৬১৮।

৪। অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে , "Indeed recently the concept has been extended to refer to 'internal colonialism' where the Capital or economically dominant part of a country treats assistant region just as it might a genuinely foreign country." দেখুন, ***A Dictionary of Modern Politics,*** (London, Europea Publications Limited, 1993) P.84. এই সংজ্ঞার আলোকে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলা যথার্থ অর্থেই পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের পিয়ার্সন কমিটি ১৯৬৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের যে মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্যের শিকার তা প্রকাশ করে। পূর্বাংশের কৃষির কোন উন্নতি করা হয়নি বরং কৃষি অনুপযোগী পশ্চিম পাকিস্তানে আধুনিক প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষির ব্যাপক উন্নতি করা হয়েছে। পিয়ার্সন কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *পূর্বদেশ* (ঢাকা) ১৬ নভেম্বর ১৯৬৯।

৫। K.P. Misra, "Intro-State Imperialism". ***Journal of Peace Research,*** No-1 (Oslo:1972) PP. 27-39.

৬। রেহমান সোহবান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬১৯

৭। ঐ

৮। ঐ, পৃঃ ৬১৯-২০

৯। ঐ

১০। ঐ

১১। ***The Dawn,*** (Karachi), Feb 16, 1971

Dhaka University Institutional Repository

১২। Rownaq Jahan, Pakistan, ***Failure in National Integration,*** (Dhaka : UPL, 1994) P.13,

১৩। General Mohammad Ayub Khan, ***Friends Not Musters : A Political Auto Biography*** (Lahore : Oxford University Press, 1967) P. 102

১৪। প্রীতি কুমার মিত্র, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬", প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃঃ ১১৬-১১৮

১৫। রেহমান সোবহান, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ৬৫৭

১৬। Rownak Jahan, ***Ibid,*** P. 176

১৭। লেলিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঃ রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি,* (ঢাকা ঃ ইউপি এল, ১৯৯৭) পৃঃ ৪৫৭

১৮। ঐ, পৃঃ ৬০৭

১৯। ***The Dawn*** (Karachi) 29 November 1969.

২০। *দৈনিক ইত্তেফাক* ২৩ অক্টোবর, ১৯৭০।

২১। Rao Farman Ali Khan, ***The Pakistan Govt. Divided,*** (Lahore; Jang Publisher, 1992) PP. 447.

২২। ***The Dawn,*** 18 January, 1971

২৩। ***Times of India,*** 18 February, 1971.

২৪। ***Bangla Desh Documents,*** (Delhi : Ministry of External Affairs, Government of India 1971), P. 293.

২৫। মুনতাসির মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৯০* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৫) পৃঃ ৪৮।

২৬। *দৈনিক পাকিস্তান,* ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

২৭। *মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্র* উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র* ৩য় খণ্ড (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২) পৃঃ ১২। এরপর থেকে শুধু দলিল হিসেবে উল্লেখিত হবে।

২৮। G.J. Starke Q.C ***An Introduction to International law*** (London : Butterworths, 1984) P. 125

২৯। Soresen (Edited), ***Manual of Public International Law*** (Delhi : Orient Lonman, 1968) P. 276

Dhaka University Institutional Repository

৩০। ***Ibid***, P. 227

৩১। L. Oppenheim (Lauterpacht), ***International Law,*** Vol-II (London : Longman, 1952) P. 249

৩২। ***Ibid***, –250

৩৩। মুজিবনগর সরকারের নথিলপত্র, *দলিল* (৩য় খণ্ড পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৩

৩৪। ঐ, পৃঃ ৬২

৩৫। লেখকের সাথে আবুল মাল আব্দুল মুহিতের সাক্ষাৎকার, অক্টোবর ১৯৯৬.

৩৬। H. Lanterpacht, International Law, (Cambridge : 1977) PP. 716-18

৩৭। ***Bangla Desh Documents, Ibid,*** PP. 228-229

৩৮। ***Ibid,*** 229-230,

৩৯। Starke, ***Ibid*** P. 134

৪০। Nurul Momen, ***Bangladesh in the United Nations : A Study of Diplomacy*** (Dhaka: UPL, 1987) P. 16

৪১। নাইজেরিয়া ছিল পাকিস্তানের প্রতি এমনি একটি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্র। নাইজেরিয়া ব্রায়াফার স্মৃতি তখন পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই জাতিসংঘ বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করতো। এছাড়া তিউনেশিয়া ও আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ একই রকম অভিমত পোষণ করতো (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আরো দেখুন S.R. Sharma, ***Bangladesh Crises and Indian Foreign Policy,*** (Delhi : 1978) P. 42-43.

৪২। Rownaq Jahan, ***Ibid,*** P. 203

৪৩। ***Manchester Guardian*** (London) August 19, 1971.

৪৪। A.M.A Muhith, ***Emergence of Bangladesh*** (Dhaka : Bangladesh Books Internationals Ltd., 1978) P. 270

৪৫। এ, এম, এ, মুহিতের ঐ সাক্ষাৎকার।

৪৬। ***Bangla Desh Documents, Ibid,*** P. 603-604.

৪৭। ***The Statesman*** 17 June, 1971

৪৮। *দলিল* ১৩ খণ্ড পূর্বোক্ত পৃঃ ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৪৯। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (ঢাকা : ভান্দ প্রকাশনী, ১৯৮২) পৃ : ৬৩

৫০। এ, এম, এ, মুহিতের ঐ, সাক্ষাৎকার।

৫১। Nurul Momen, ***Ibid,*** P. 15

৫২। *বাংলাদেশ নামে দেশ* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০) পৃঃ ৯৪

৫৩। Mohammad Ayoob & K. Subrahmanyam, ***Liberation War*** (Delhi : S. Chand & Company Ltd., 1972) P. 169

৫৪। *দৈনিক আনন্দবাজার* (কলকাতা) ৬ মে ১৯৭১

৫৫। মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্র, *দলিল* (৩য় খণ্ড) পৃঃ৭৬৯

৫৬। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কার্যবিবরণী, *দলিল* (১২ খণ্ড) পৃ : ২২৭

৫৭। ***Lok Shava Proceedings,*** 18th June 1971, 5th Series, 2nd session, Vol-3, (Delhi, 1972)

৫৮। ***Amrita Bazar Patrika,*** May 7, 1971

৫৯। মঈদুল হাসান, মূলধারা ৭১ (ঢাকা : ইউ পি এল, ১৯৮৬) পৃ : ১৪-১৫

৬০। *কালান্তর* (কলকাতা) ২৩ মে, ১৯৭১

৬১। *যুগান্তর* (কলকাতা) ১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

৬২। এ.এম.এ মুহিতের ঐ, সাক্ষাৎকার।

৬৩। ***Lok Shava Proceedings,*** 6th December 1971 5th Series, (Delhi, 1972)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

শরণার্থী সমস্যা, বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বেই শরনার্থী সমস্যাটির সৃষ্টি এবং দ্রুত এটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংকট থেকে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত হয়। প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে 'অপারেশন সার্চ লাইটের'- মাধ্যমে যে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হয়, তারই প্রতিক্রিয়ার প্রাণভয়ে নিরাপত্তার সন্ধানে লাখ লাখ মানুষ পার্শ্ববর্তী ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রাম ও শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। এপ্রিল মাসে শরনার্থীর সংখ্যা ছিল ১,১৯,৫৬৬ জন এবং পরবর্তী মাসগুলোতে তা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৫ ডিসেম্বরে শরনার্থীর সংখ্যা ৯৮,৯৯,৩০৫ জনে উন্নীত হয়।[১] জাতিগত নিপীড়ন, হিন্দু বিদ্বেষ ও গণহত্যার কারণেই দক্ষিণ-এশিয়ায় এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এই বিয়োগান্তক ঘটনার বহুমাত্রিকতা যেমন খাদ্য, পানীয়, ঔষধপত্রের সমস্যা, মাথাগোজার ঠাঁই, কলেরা, মহামারী ইত্যাদি একটি সমস্যা সঙ্কুল জটিল গ্রন্থি তৈরী করে। জাতিসংঘের ভাষায়, "The organization (UN) mounted largest humanization operation in its history during and after in conflict over Bangladesh in 1971".[২] ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখান শরণার্থী সমস্যাকে জাতিসংঘের জন্যে একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করেন।[৩] বর্তমান অধ্যায়ে জাতিসংঘের এই মানবিক তৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেয়া হবে পাশাপাশি বৃহৎ শক্তিগুলো ও ভারত নিজেদের জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করেও যে এই তৎপরতায় সম্পৃক্ত হয়েছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরা হবে ।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংকটের রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে জাতিসংঘ দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ডিসেম্বরের প্রথম দিক পর্যন্ত কোন উদ্যোগই নেয়নি। তবে শরণার্থী সমস্যা ও মানবিক বিষয়ে জাতিসংঘ প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছিল।[৪] উপমহাদেশে জাতিসংঘের দুটো মিশন কাজ করে। এর একটি পরিচালিত হয় ভারতে এবং অন্যটি পরিচালিত হয় দখলীকৃত বাংলাদেশে। এখানে জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বিভিন্ন সময় হস্তক্ষেপ করে।[৫]

তৃতীয়ত, শরণার্থীদের মানবিক দুর্দশা, ভরণপোষণ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ছাড়াও সমস্যাটির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল। এটি হলো শরণার্থীদের কারনেই ভারত বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

শরণার্থীর সংজ্ঞা

প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন ওঠবে শরণার্থী বলতে কী বুঝায় ? বা শরণার্থীর সংজ্ঞা কী ? জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার অফিস (UNHCR) এর ১৯৫১ সালের সংবিধি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি তখনই শরণার্থী হতে পারেন,

> Owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside of the country of his former habitual residence, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it."[৬]

International Committee for European Migration (ICEM) শরণার্থীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে আরও ব্যাপক অর্থে । *ICEM* মনে করে যে, যিনি যুদ্ধ কিংবা দুর্যোগের শিকার হয়েছেন এবং যার ফলে তার জীবন যাত্রা ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়েছে তাকেই শরণার্থী বলা যায়।[৭] "শরণার্থীর ধারণা" সম্পর্কে ১৯৫১ সালের সংবিধি এবং *ICEM* এর সংজ্ঞাকে সমন্বিত করে আন্তর্জাতিক আইনবিদ ***ELFAN REES*** *তার* ***We strange and Affraid (1959)*** গ্রন্থে একটি যুগোপযোগী সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে " A refugee is anyone also has been uprooted from his home, has crossed a frontier- artificial or traditional and looks for protection and sustenance to a government or authority others than his former one."[৮] ১৯৯৭ সালে শরণার্থী বিষয়ক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত দক্ষিণ-এশীয় আঞ্চলিক কর্মশালায় শরনার্থী সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হলো ঃ

A refugee is :

a. Any person who is outside his or her country is unable or unwilling to return to, and is unable or unwilling to avail himself or herself of the protection of that country because of well founded fear of persecution

Dhaka University Institutional Repository

on account of race, religion, sex, nationality, ethnic identity, membership of a particular social group or political opinion, or,

b. Any person who owing to external aggression, occupation, foreign, domination serious violation of human rights or other events seriously disrupts public order in either part or whole of his or her country of origin, is compelled to leave his or her place of habitual residence in order to seek refugee in another place outside his or her country.[৯]

এ সকল সংজ্ঞার আলোকে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ১৯৭১ সালে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি জনগোষ্ঠী শরণার্থী ছিলেন।

শরণার্থীদের ভারতে প্রবেশ

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা গেছে যে, শরণার্থীরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে অন্যদেশে আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী বর্বরতার শিকার অসংখ্য মানুষ বিশেষত ইহুদী নরনারী জার্মানী থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার চিত্র ছিল ভয়াবহ এবং এর সাথে শুধু নাৎসী বর্বরতার তুলনা করা যায়। বিশ্বের ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক মানুষের নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ১৯৭১-এ বাংলাদেশে।[১০] মোহাম্মদ আইয়ুব ও কে, সুব্রামানিয়াম এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "The Killing of Bangla Desh (Bangladesh) were equal to the use of seventy five Hiroshima type nuclear weapons"[১১] গণহত্যার এ চিত্রটি অতিরঞ্জিত ছিল না । ইয়াহিয়ার এককালীন মন্ত্রী ও পাকিস্তানপন্থী লেখক জি. ডব্লিউ. চৌধুরী (G.W. Chowdhury)- এর লেখায় এ গণহত্যার স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি লিখেছেন,

It is most tragic that the Pakistani Army instead of penalizing the person who eliminated all chances of settlement plunged into ruthless and unprecedented atrocities on unarmed Bengali population – a vile campaign in which thousand of innocent women, old people, sick people and children, were brutally murdered, million fled there homes to take their shelter in India."[১২]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে জি.ডাব্লিউ চৌধুরী স্বীকার করেছেন যে, শিশু, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা গণহত্যা পরিচালিত করে এবং লাখ লাখ মানুষ তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। প্রথম পর্যায়ের গণহত্যার পরও এপ্রিল মাসে শরণার্থীর সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলনা। এ সময় নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামীলীগের প্রথম সারির নেতাকর্মীরা এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্‌সের সদস্যরা ভারতে প্রবেশ করে।[১৩] এপ্রিল মাসে ঢাকায় কেন্দ্রীয় 'শান্তিকমিটি' গঠিত হয় এবং ক্রমশ তা সমগ্র দেশে সম্প্রসারিত হয়। একইভাবে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগী হিসেবে রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর জন্ম হয়। প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন সমাজকর্মী ফাদার টিম এসব বাহিনীর সদস্যদের 'গুন্ডা' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৪] বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিরোধী এসব বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের খুঁজতে থাকে এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। ফলে মে মাসের শুরু থেকেই দেশত্যাগী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে ।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও ত্রাণমন্ত্রী আর, কে, খাদিলকর মে মাসের শেষে রাজ্য সভায় এক বিবৃতিতে শরণার্থী বিষয়ক একটি পরিসংখ্যান প্রদান করেন। এটি হলো ঃ

সারণী - ৩.১

শরণার্থীদের ভারত গমনের প্রাথমিক চিত্র

তারিখ	সারণীর সংখ্যা
২৪ এপ্রিল	৫, ৩৬, ৩০৮
১ মে	১২, ৫১, ৫৪৪
৭ মে	২৬, ৬৯, ২২৬
২১ মে	৩৪, ৩৫,২৫৩

সূত্র ঃ ১. Keesing Contemporary Archives P. 24685

২. Bangladesh Documents P. 672

Dhaka University Institutional Repository

শরণার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা দখলীকৃত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে এবং মূলত হিন্দুদের উচ্ছেদ করে।[১৫] ফাদার ডব্লিউ টিম হিন্দুদের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী বাঙালি ও বিহারীদের নির্যাতনের বেদনাদায়ক বিবরণ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি জাতিসংঘের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ অভিযোগ পেশ করেছিলেন।[১৬] দখলীকৃত বাংলাদেশে সমর্থনহীন সামরিক জান্তা কিছু 'বিভ্রান্ত' ও 'লোভী' মুসলিমদের মধ্যে উচ্ছেদকৃত হিন্দুদের সম্পত্তি বিতরণ করে।[১৭] এভাবে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের উচ্ছেদের শুরু এবং তাদেরকে ভারতে ঠেলে দেয়া হয়। সারণি ৩.২ এ বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়।

সারণি - ৩.২

শরণার্থীদের ধর্মীয় পরিচয়

ধর্ম	সংখ্যা (লক্ষে)
হিন্দু	৬৯.৭১
মুসলিম	৫.৪১
অন্যান্য	০.৪৪

সূত্র ঃ Bangla Desh Documents, P. 446

ব্যাপকভাবে নির্যাতনের কারণে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ যে শরণার্থী হয়েছিল তার একটি 'কার্যকরণ' খুঁজে পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শী হুমায়ুন আহমেদের বিবরণীতে। তিনি লিখেছেন ঃ

> হিন্দুদের জন্য তখন সব পথ বন্ধ। হিন্দু জানলে দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ নেই-গুলি। হিন্দু পরিবারগুলো বাড়িঘর ছেড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল জঙ্গলে। বর্ষাকালের সাপ-কোপ ভর্তি জঙ্গল। দিনরাত বৃষ্টি পড়ছে, বর্ণনার অতীত সব দৃশ্য। এরা পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতেও পারছেনা। যেতে হবে সুন্দরবন হয়ে। নদীতে ঘুরছে মিলিটারী গানবোট।[১৮]

হুমায়ুন আহমেদের ভাষ্য অনুসারে হিন্দুরা যে কারণে দেশত্যাগ করে তারই প্রতিফলন দেখা যায় সারণি ৩.২ এ। আমরা দেখি যে, আগষ্ট মাস পর্যন্ত হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৬৯ লক্ষ ৭১ হাজার এবং মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার। অর্থাৎ হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ১২ গুনের চেয়ে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

শরণার্থী সমস্যা ও ভারত

বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) গণহত্যা শুরুর পর পরই ভারত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে ২৭ মার্চ এক বক্তৃতায় বলেন,"আমাদের ভূখন্ডের একেবারে সন্নিকটে নিরস্ত্র ও নিরপরাধ মানুষের ওপরে যে নজিরবিহীন নির্যাতন চলছে আমাদের জনগণ তার তীব্র নিন্দা না করে পারেনা। পূর্ববঙ্গের জনগণের এই মহান সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতি সমর্থন ও সহৃদয় সহানুভূতি অব্যাহত থাকবে।"[১৯] ৩১ মার্চ লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে পাকিস্তান সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হয়।[২০] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতের এই শর্তহীন সমর্থন শুধু মানবিক ছিল তা বলা যায় না। এর পিছনে কাজ করেছে ভারতের জাতীয় স্বার্থ। ইন্দিরাগান্দীর জীবন আলেখ্যের রচয়িতা ভারতীয় গবেষক Inder Malhotra লিখেছেন, "Humantirain feelings were the main motivating force behind this outcry. But many Indians also saw in the heart rending situation an opportunity to cut Pkistan down to size."[২০] ভারতীয় সমর কৌশলের প্রবক্তারা জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকেই বড় করে দেখেছেন। ৩১ মার্চ নয়াদিল্লীতে এক সেমিনারে The Institute for Defense Studies and Analysis (IDSA) এর পরিচালক কে সুব্রামানিয়াম বলেন, "What India must realize is that the break up of Pakistan is in our interest, the like of which will never come again."[২২] ঐ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীরাও সুব্রানিয়ামের সাথে সহমত পোষণ করেন। কেহ কেহ আবার বলেছিলেন যে, "বাংলাদেশে সংকট চলতি শতকে ভারতকে এমন একটি সুযোগ এনে দিয়েছে যার মাধ্যমে ভারত তার এক নম্বর শত্রু পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারে।"[২৩] আবার বন্ধুদেব বসুর মত সাহিত্যিক কেন্দ্রীয় শাসন বিনষ্ট হবার ভয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল মত পোষণ করতেন না।[২৪] ভারতের কিছু বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ মনে করেন যে, ইন্দিরাগান্ধী ক্রমবর্ধমান নকশাল আন্দোলনকে দমন করার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।[২৫]

ভারতীয় রণকৌশলের প্রণেতা, সাহিত্যিক ও বামপন্থী রাজনীতিবিদদের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাতীয় স্বার্থেই ভারত পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হটকারী পদক্ষেপ ও বর্বর কর্মকাণ্ডের সৃষ্ঠ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে। তবে প্রধানত মানবিক কারণে ভারত শরণার্থীদের সাহায্য প্রদানে এগিয়ে আসে।[২৬] এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে দ্রুত বিষয়টি উত্থাপন করে। ১লা এপ্রিল ১৯৭১-এ জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমরসেন নির্লিপ্ত জাতিসংঘের সমালোচনা করে একটি বার্তা মহাসচিবের কাছে হস্তান্তর করেন। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

বার্তায় বলা হয়, "বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে চুপচাপ থাকার সময় আর নেই। মানব দুর্গতির এ মুহূর্তে জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতাকে দুর্গত জনগণ উদাসীনতা মনে করবে।"[২৭]

সরকারি পর্যায়ে ভারতের নীতির প্রধান দুটি দিক ছিল। প্রথমত, মানবিক কারণ, দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থ। এর মধ্যে কোনটি বেশী প্রাধ্যান্য পেয়েছিল তা বিতর্কিত বিষয়। অবশ্য ভারতের সিভিল সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল একান্তই মানবিক। বিশেষ করে ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামসহ অন্যান্য রাজ্যের মানুষ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। বাংলাদেশের সমর্থনে ১ এপ্রিল উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হরতাল পালিত হয়। বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর এই প্রথম পশ্চিম বাংলার মানুষ পূর্ববাংলার বাঙালিদের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি ও সমর্থন জানায়।[২৮] ১৯ এপ্রিল ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।[২৯]

পাশাপাশি ভারতের একটি মহলের ধারণা ছিল যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের সাথে যোগ দিবে এবং তামিলনাড়ু, কাশ্মির ও পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।[৩০] মুহাম্মদ আইয়ুব ও কে সুব্রামানিয়াম শরণার্থী সম্পর্কে ভারতের এলিট শ্রেণীর বিচিত্র মনোভাবের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁরা লিখেছেন যে, একদল মনে করতো যে, শরণার্থী পূর্ণবাসনে ভারত যে বিদেশী সাহায্য পাবে তা থেকে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। আবার অনেকে ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে যুক্তি দেখালো যে, কাজের জন্য অতিরিক্ত কিছু শ্রমিক পাওয়া গেছে।[৩১] অন্যদিকে অবাঙালি অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে শরণার্থী ছড়িয়ে দেবার জন্যে ভারত সরকারের উদ্যোগও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের মত রাজ্যগুলো প্রথম পর্যায়ে শরণার্থী গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।[৩২] অবশ্য ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ ও কেন্দ্র সরকার প্রথম থেকেই শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২২ এপ্রিল এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্যে সকল রাজ্য সরকারকে আবেদন জানায়।[৩৩] ঐ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কে খাদিলকর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে জানায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ তৎপরতার সমুদয় ব্যয় বহন করবে।[৩৪] ৫ মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ান বিধান সভায় বলেন, "বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা যারা ভারতে আশ্রয় চাইবেন তাদের আশ্রয় দেয়া পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের নীতি হবে।"[৩৫] ৮ মে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ৫টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ জাতির উদ্দেশ্যে এক বিবৃতিতে শরণার্থী সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার

Dhaka University Institutional Repository

আবেদন জানান। তারা স্পষ্ট করে বলেন, "এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে এই শরণার্থীরা আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারে এবং সেজন্যে কেন্দ্রকে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে হবে।"[৩৬]

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর এই আহবানের পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী ১৬ মে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বেশকিছু শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। ১৬ মে তিনি কলকাতার দমদম বিমান বন্দরে বলেন যে, "শরণার্থী সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা এবং এটি মোকাবিলা করা একটি কঠিন কাজ বিশেষ করে আমাদের খাদ্য সামগ্রীর অভাব রয়েছে।"[৩৭] ১৮ মে রানীক্ষেতে এক জনসভায় ভাষণদানকালে ইন্দিরাগান্ধী শরণার্থী সমস্যা অনুধাবনের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতি আহবান জানান এবং বলেন যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ক্রমশ ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, "The burden is heavy on us, how can we ignore the helpless refugee ?"[৩৮] ১৬ জুন ইন্দিরাগান্ধী রাজ্যসভায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, "আমরা অবশ্যই পূর্ববঙ্গ প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধান চাই। বিশেষ করে যেখান থেকে তারা প্রাণভয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে।"[৩৯]

শরনার্থী ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টের রাজ্য ও লোক সভায় অসংখ্যবার আলোচনা হয়েছে। নিচের সারণি থেকে ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

সারণী - ৩.৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতীয় পার্লামেন্ট

পার্লামেন্ট কক্ষ	মোট অধিবেশন	বাংলাদেশ প্রাপ্ত বৈঠক	প্রশ্নাকারে উত্থাপিত
রাজ্যসভা	৮০	৬৭	২২২
লোক সভা	৯২	৭৩	২৯৬

সূত্র ঃ ভারতের রাজ্যও লোকসভার কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

হস্তক্ষেপের পটভূমি তৈরী ও আন্তর্জাতিক সাহায্য

ভারত সরকারের এই প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারত ৩ ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত শরণার্থী সমস্যাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছে । প্রধানত দুটো লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত শরণার্থী বিষয়ে স্বীয় নীতি প্রণয়ন করে। যথা ঃ

ক. বাংলাদেশ সংকটের আন্তর্জাতিকীকরণ ও হস্তক্ষেপের পটভূমি তৈরী করা;

খ. জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সাহায্য পাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম লক্ষ্যটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভারত শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম বর্হিবিশ্বে জোরালো প্রচারণায় অংশ নেয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী ১৮ মে বৃহৎ শক্তির প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন যে, শরণার্থীদের দায়দায়িত্ব বহন করতে বৃহৎশক্তিগুলির এগিয়ে আসা উচিত।[৪০] পাশাপাশি ভারত অবরুদ্ধ বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের পটভূমি রচনা করে। বিশেষ করে শরণার্থীদের আগমনে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়। ভারতীয় গবেষক Inder Malhotra-এর ভাষ্য হলো, "Refugee problem were threatening India's security and its very existence"[৪১] ভারত যুক্তি দেখায় যে, পাকিস্তান তার বেসামরিক নাগরিকদের ভারতে ঠেলে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে। ভারত তাই এই 'সিভিল আগ্রাসন' এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি আক্রমনের হুমকি দেয়। আন্তর্জাতিক আইনে এটি ' Self Defense বা আত্মরক্ষার্থে প্রতিআক্রমণ বলে পরিচিত।[৪২] ভারত কীভাবে হস্তক্ষেপের পটভূমি প্রস্তুত করে তার একটি বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ব্রিটেনের ***FINANCIAL TIMES*** এর ভাষ্যে। এ পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়।

> পূর্বাঞ্চলে তার (ইয়াহিয়া) নীতি হঠকারিতাপূর্ণ আহাম্মকিতে ভরা এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দমন করার জন্যে বর্বরও বটে। তবে মিসেস গান্ধীর সরকার পূর্বপাকিস্তানে (বাংলাদেশে) ইয়াহিয়ার নীতিকে সুচারুরূপে কাজে লাগিয়েছে যাতে যুদ্ধ বাঁধে। দিল্লী শরণার্থীকে ব্যবহার করছে অংশত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাত স্বরূপ। অংশত ভারতীয় সৈন্যের পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমন করার আবরণ স্বরূপ।[৪৩]

মার্কিন সাময়িকী ***Newsweek*** আরও স্পষ্ট করে শরণার্থী প্রশ্নে ভারতের দুটো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। এ সাময়িকীর দৃষ্টিতে,

> ভারতীয়দের মতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে লোকসানের চেয়ে লাভের পরিমাণ হবে বেশী। প্রথমত, শরণার্থী সমস্যার সমাধান হবে। সবচেয়ে বড়কথা পাকিস্তানের ভাঙনের ফলে উপমহাদেশে ভারতের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এন্ড কোং এর উদ্দেশ্য এশিয়ায় পিকিং এর প্রবল প্রভাব ক্ষুন্ন করা সম্ভব হবে।[৪৪]

শরণার্থীদের জন্যে জাতিসংঘ ও অন্যান্য দিক থেকে সাহায্য

ভারত শরণার্থীদের নিজে যেমন সাহায্য করেছে তেমনি শরণার্থীদের জন্যে এসেছে বিপুল আন্তর্জাতিক সাহায্য। জাতিসংঘের ইতিহাসে এটি ছিল আকাশ পথে সবচেয়ে বৃহৎ সাহায্য। জুন পর্যন্ত জাতিসংঘ ও অন্যান্য উৎস থেকে ভারতের প্রাপ্ত ও প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩.৪

(ভারতে আন্তর্জাতিক সাহায্য- জুন ১৯৭১)

জাতিসংঘ	অন্যান্য উৎস	মোট
৯,৮০,০০.০০	১৬,৫০,০০,০০০	২৬,৩০,০০.০০০

সূত্র ১. Inter national Herald Tribure Paris, 8 July 1971.
২. UN News Letter (Newyork, Un Publications July, 1971) PP-1, 4, 9.

শরণার্থী সাহায্যে বিভিন্ন দেশ

ভারতে বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্যে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা এগিয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো সাহায্য প্রেরণ করে। সারণি ৩. ৫ এ তিনটি দেশের সাহায্যের পরিমাণ দেখানো হলো ঃ

সারণি - ৩.৫

শরণার্থীদের সাহায্যে বিভিন্ন দেশ

দেশ	অনুদান
যুক্তরাষ্ট্র	৭,০৫,০০,০০০ ডলার
ব্রিটেন	৭২,০০,০০০ "
জাপান	৫০,০০,০০০ "
মোট	৮,২৭,০০,০০ "

সূত্র ঃ Kessing contemporary Archives P-24990

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ পরবর্তীকালে আরো বেড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় লেখক Surjit Mansingh -এর মতে, ১৯৭১-৭২ সালে শরণার্থী খাতে যুক্তরাষ্ট্র মোট ৯৪.৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়।[৪৫] অন্যদিকে জাপানি জনগণ তাদের 'এশীয় ভ্রাতাদের' সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিল। সারণি ৩.৬ এবং সারণি ৩.৭ এ জাপানি সাহায্যের পরিমাণ দেখানো হল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ৩.৬

শরণার্থীদের জন্যে রাজপথ কর্মসূচির মাধ্যমে সংগৃহকৃত অর্থ

তারিখ	উৎস	অর্থ
২১ নভেম্বর	রাজপথ কর্মসূচি	১২,০০০ ইয়েন
২৩ নভেম্বর	রাজপথ কর্মসূচি	৭০,০০ ইয়েন
২৮ নভেম্বর	রাজপথ কর্মসূচি	২,০০,০০০ ইয়েন
৫ ডিসেম্বর	রাজপথ কর্মসূচি	২,২০,০০০ ইয়েন
১২ ডিসেম্বর	রাজপথ কর্মসূচি	২,৩০,০০০ ইয়েন
		মোট ৭,৩২,০০০

সূত্র ঃ Sukumer Biswas, ***Emergence of Bangladesh : Japanese View*** (Tyoko, Japan, IDE, 1997) PP-109-111

সারণি - ৩.৭

জাপানের সাহায্য

তারিখ	দ্রব্যের পরিমাণ
৩ ডিসেম্বর	৫২৫ কার্টুন (২৭,০০০) কাপড়
১৩ জানুয়ারী ১৯৭২	২৭০০ কার্টুন (১৩,০০.০০০) কাপড়
১৬ জুন ১৯৭২	২৫০ কার্টুন (১২,০০০) কাপড়

সূত্র ঃ Sukumer Biswas, ***Ibid***, P-110-111

ভারত সরকার ও ভারতীয় মিডিয়া এই সাহায্যকে অপ্রতুল বলে দাবি করে। শরণার্থী খাতে ১৯৭১-৭২ সালে আনুমানিক ব্যয়ের হিসেব ধরা হয় ৫৫৮ মিলিয়ন।[৪৬] জাতিসংঘ ও অন্যান্য উৎস থেকে জুলাই ১৯৭১ পর্যন্ত ভারত সরকারকে ২৬৩ মিলিয়ন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় (সারণি- ৩.৪ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী মাসগুলোতে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে আরো সাহায্য ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। যদিও প্রতিশ্রুত সাহায্যের সবটুকু পাওয়া যায় নি। এই প্রতিশ্রুত সাহায্যের একটি অংশ প্রথমে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে এবং পরবর্তীতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব বিষয়ে বিবেচনা করে বলা যায়

Dhaka University Institutional Repository

যে, শরণার্থীদের পেছনে ভারত যে অর্থ ব্যয় করেছে তার বেশীর ভাগই তাকে বহন করতে হয়েছে। এজন্যে ১৯৭১ এবং পরবর্তী কয়েক বছর ভারতীয় জনগণকে কর প্রদান করতে হয়েছে। একই কারণে ১৯৭১ পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটের জন্যে ইন্দিরা গান্ধীর প্রচুর সমালোচনা হয় এবং পরবর্তী নির্বাচনে তার পরাজয়ের এটি একটি অন্যতম কারণ ছিল।[৪৭]

ভারতে শরণার্থী পরিস্থিতি

ভারতে শরণার্থীদের অস্বাভাবিক আগমনের ফলে সেখানে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে ওঠে। সীমান্তের শিবিরগুলোতে আশ্রয় না পেয়ে শরণার্থীদের অনেকেই খোলা আকাশের নীচে, রাস্তায়, ফুটপাতে এবং রেল ষ্টেশনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতীয় সাংবাদিক অমিত মিত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবাদিক হারুন হাবীব লিখেছেন, " বর্তমানে শরণার্থীদের আসায় কলিকাতার বাসিন্দাদের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে গেছে যে ভালভাবে হেঁটে বেড়ানো দুষ্কর হয়েছে। শিয়ালদহ, হাওড়া এবং প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে বাসিন্দাদের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে গেছে যে, ট্রেন চলাচলে প্রায় বিপর্যয়। কলকাতার প্রতিটি রাস্তা অবরুদ্ধ।"[৪৮] অন্যদিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় ৬ মে ১৯৭১ -এ ৪ লাখ শরণার্থী আশ্রয় নেয়[৪৯] এবং যা পরবর্তীকালে ১৪ লক্ষে উন্নীত হয়। এই সংখ্যা ছিল গোটা ত্রিপুরার জনসংখ্যার সমান।[৫০] স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায় এবং সন্তানদের চরম ক্ষতি স্বীকার করেও বিবেকবান অভিভাবকরা শরণার্থীদের ঠাঁইহীন করতে রাজি হননি। যদিও ত্রিপুরার শিক্ষাবিভাগ স্কুল খোলার একটি উদ্যোগ নেয়, তবুও জনগণের প্রতিরোধের মুখে তা সফল হননি। আগরতলার শীর্ষস্থানীয় দৈনিক *সংবাদ*-এ একজন পত্র লেখক অমানবিক পরিস্থিতির একটি বিবরণ দেন। এতে বলা হয়, "আগরতলা শহরের কয়েকটি বিদ্যালয়সহ মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ত্রিপুরার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান শরণার্থী দ্বারা পরিপূর্ণ। ছাত্র আসেনা, কোন ঘর খালি নেই, শিক্ষকদের বসবার জায়গা নেই। বিদ্যালয়গুলোর চারপাশে আর্বজনায় ভরা, বাতাসে দুগন্ধ ভেসে আসে, অথচ কর্তৃপক্ষ নির্ভাবনায় ঘোষণা করলেন স্কুল খুলতে হবে।"[৫১] প্রতিবেশী জনগণের এই বিপর্যয়ে এ ধরনের বক্তব্য একটি-মানবতাবাদী দৃষ্টান্ত। বস্তুত ভারতীয় জনগণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। ভারত সরকারও শরণার্থীদের সাহায্যে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালায়। ভারতীয় জনগণ ও ভারত সরকারের সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের পরও শরণার্থীদের অবস্থা অনেকাংশে মানবেতর থেকে যায়। সোভিয়েত মুখপত্র *প্রাভদা* ২৪ অক্টোবর সংখ্যায় অমানবিক পরিস্থিতির করুণ চিত্র তুলে ধরে। *প্রাভদা* লিখে,

> শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে নারিকেল পাতা ও হোগলা ছাওয়া ব্যারাকে, সাধারণ তাবুতে, নীচু কুঠিরের ভেতরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না এবং এমনকি চারটি খুঁটির উপর ওয়েলক্লথ

Dhaka University Institutional Repository

> চাপিয়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন। .... বস্তুত এ এক নৈরাশ্যকর দৃশ্য। গৃহহীন মানুষ যদি ভারতের উদার সাহায্য না পেত তাহলে অনাহার ও মহামারীর সংখ্যা আরো বেশী হতো।[৫২]

ব্রিটেনের ***Sunday Times*** এর ১৩ জুন সংখ্যায় প্রখ্যাত সাংবাদিক মারে সালি "দুঃখের মিছিল" শিরোণামে শরণার্থী জীবনের মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরেন। তার রিপোর্টে কলকাতার অদূরবর্তী বারাসাত শহরের একটি করুন চিত্র ফুটে উঠে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুদিত উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

> কলকাতা ও পূর্বপাকিস্তান সীমান্তের মাঝখানে এই কর্দমাক্ত শহরটিতে (বারাসাত) অবস্থিত। এর স্বাভাবিক জনসংখ্যা ২১০০০। এশীয় মানদন্ডে বিচার করলে এখানকার হাসপাতালটি কোন রকমে এই অধিবাসীদের চিকিৎসা ও স্বাস্থের ব্যবস্থা করতে পারে। গত সপ্তাহে দেড় থেকে দুলাখ লোক বারাসাতে বন্যার স্রোতের মত ঢুকে পড়েছে। তারা শহরের চারিদিকে ধানি জমিতে গিজ গিজ করছে। স্কুল, কলেজ, সিনেমা হলে এবং টুকরো টুকরো পবিত্র জমিতে এদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাছোড় পিপড়ার সারির মতো রাস্তা বেয়ে চলেছে শরণার্থীর অন্তহীন স্রোত। তাদের খালি পা, খালি গা, শীর্ণদেহ মেয়েদের দেহে শাড়ীর মত করে প্যাঁচানো আর পুরুষদের কোমরে জড়ানো এতটুকু করে কাপড়। পাঁচ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ। ..... হাসপাতালের প্রধান ঘরটির দুখানি কলেরা বিভাগ। এতে বিছানা নেই। পাকা মেঝের উপর ধাতব পাতে রাগীরা শোয়।..... কয়েকজন লোক মৃতদেহগুলো নিয়ে যাচ্ছে। তাদের একজনের নাকে কাপড় বাঁধা। কাপড়ে ঢাকা মৃতদেহগুলোকে একটা আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে।[৫৩]

শরণার্থীদের এই অমানবিক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়েছিল কলেরা মহামারি ও মৃত্যুর মর্মান্তিক হাহাকার। ভারতের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক *আনান্দবাজার* ৫ জুন জানায় যে, কলেরায় প্রায় ২০০০ শরণার্থীর মৃত্যু হয়েছে।[৫৪] অবশ্য ভারতীয় হিসেবে কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম করে দেখানো হয়েছিল। কারণ ব্রিটিশ পত্র পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায় যে, জুন মাসে প্রতিদিন প্রায় ১০০০ বেশী শরণার্থী মারা যেত।[৫৫] ফলে শরণার্থীদের নূন্যতম সুযোগ সুবিধা প্রদান ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভারতীয় সূত্র থেকে ৫ জুন ১৯৭১ পর্যন্ত শরণার্থীদের যে পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় তাতে অনুমান করা যায় (সারণি-৩.৮ দ্রষ্টব্য) যে পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩.৮

(বিভিন্ন আশ্রয়স্থলে শরণার্থী)

স্থান	সংখ্যা
শিবিরাসী	২৩,০৩,৩৩৪
গাছতলা	১৫,৫৯,১৪৪
আত্মীয় গৃহে	২,০০০০০
মোট	৪০,৬২,৪৭৮ জন

সূত্র : *আনন্দবাজার পত্রিকা* ৫ জুন, ১৯৭১

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পর্যন্ত শরণার্থীদের সংখ্যা হচ্ছে ৪০,৬২,৪৭৮ জন এবং এর মধ্যে ১৫,৫৯,১৪৪ জন গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছেন। এদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মত অতি জরুরি মৌলিক চাহিদাও সরবরাহ সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে সোভিয়েত, ব্রিটিশ ও ভারতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত যে সকল রিপোর্ট এখানে আলোচনা করা হয়েছে তাতে শরণার্থী পরিস্থিতির অমানবিক চিত্রই ভেসে ওঠে। মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান শরণার্থী জীবনের দুঃসহ অবস্থা সম্পর্কেও নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। আনিসুজ্জামান লিখেছেন,

> সামনে শিশু কোলে নিয়ে এক মা দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক যেই দুধ দিতে যাবেন, পেছনে থেকে কেউ তখন কেউ বলল, ওকে দিবেন না ও বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারে। ভদ্রলোক মগে দুধ উচিয়ে ইতস্তত করছেন, দেবেন কি দেবেন না । ভদ্রলোকের মুখের দিকে এক মুহূর্তে তাকালো সামনে দাড়ানো মেয়েটি। তারপর কাপড় সরিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলে নিজের বুক অনাবৃত করে দিল- সন্তানকে স্তন দানের ক্ষমতা আছে কিনা, দাতা তা নিজেই বিচার করুন।[৫৬]

শরণার্থীদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় জনগণ ও শ্রমিকদের সাথেও শরণার্থীদের সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং বেশ কয়েকজন শরণার্থী প্রাণ হারায়। স্থানীয় শ্রমিকদের সাথে তাদের সংঘর্ষের কারণ ছিল অর্থনৈতিক। শরণার্থীরা কাজ করছিল অপেক্ষাকৃত সস্তায় দৈনিক এক রূপি মজুরীতে। কিন্তু স্থানীয় শ্রমিকরা তিন রূপিতে কাজ করতো। স্থানীয় জনগণের কেউ কেউ শরণার্থীদের অবাঞ্ছিত উপদ্রুত হিসেবেও বিবেচনা করতো।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

শরণার্থী সমস্যা ও পাকিস্তান

পূর্ব বাংলায় গণহত্যার ফলে শরণার্থীদের ভারত যাত্রার দৃশ্য, ভারতে শরণার্থী শিবির, গাছতলায় এবং অন্যান্য স্থানে তাদের যে করুণ ছবি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ফুটে উঠে তা পাকিস্তান সরকারের জন্য এক বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দেয়।[৫৮] পূর্বাঞ্চলে ইয়াহিয়ার পোড়ামাটি নীতি বেসরকারিভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের মানুষ এবং সরকারিভাবে চীন, মুসলিম দেশগুলো ও যুক্তরাষ্ট্র ব্যাতিরেকে প্রায় সকল রাষ্ট্রের কাছে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়। ১৮ মে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলেন, "পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রমবর্ধমান শরণার্থীর আগমনের মুখে ভারত তার জাতীয় স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।"[৫৯] ইন্দিরাগান্ধীর এ ঘোষণা পকিস্তানের জান্তা সরকারকে বিচলিত করে। তাই দেখা যায় এর তিন দিন পর ২১ মে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক সরকারি ঘোষণায় ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি শরণার্থীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।[৬০] এ ঘোষণার পর কিছু দোদুল্যমান সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং আওয়ামীলীগের বিভ্রান্ত দু তিন জন এম পি অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ফিরে আসেন।[৬১]

অবশ্য ব্যাপক জনগণের কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। কারণ ইয়াহিয়ার ঘোষণাকালে ভারতে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৪, ৩৫, ২৪৩ জন একমাস পরে তা ৬০ লক্ষে উন্নীত হয়।[৬২] এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের মত পরিবেশ ছিলনা। অবশ্য বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করতে পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। ৩০ মে পাকিস্তান সরকারিভাবে ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের জন্যে বেশ কিছু ক্যাম্প খোলে। পাশাপাশি ১ জুন পাক সরকার জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখান এবং মিত্র রাষ্ট্রসমূহের প্রতি ভারতকে সাহায্য না করতে আবেদন জানায়।[৬৩] পাকিস্তান সরকারের কর্মকাণ্ডকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত জামাত-ই-ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক *সংগ্রাম*। ২ জুন এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "ভারত সরকার যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পাবে তা বন্ধ হয়ে যাবে বলে গড়িমসি করছে। ভারত শরণার্থী সমস্যা টিকিয়ে রাখার জন্য ধুয়া তুলেছে যে, শরণার্থীদের পাকিস্তানে ফিরে যাবার কোন পরিবেশ নেই।[৬৪] দৈনিক The Dawn ও খুব একটা পিছিয়ে থাকেনি। পত্রিকাটি ২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বিভিন্ন জেলা থেকে ভারতে আশ্রয়গ্রহনকারী শরণার্থীদের একটি পরিসংখ্যান দেয়। এটি হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ৩.৯

শরণার্থীদের পাকিস্তানি পরিসংখ্যান

জেলা	শরণার্থী	জেলা	শরণার্থী
বগুড়া	১,০৬,৮৪২	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৬,০০০
কুমিল্লা	১,৬৪,০০০	ময়মনসিংহ	৭৫,০০০
পটুয়াখালী	২	দিনাজপুর	২,৬০,০০০
পাবনা	৯,৩৪৭	কুষ্টিয়া	৫০,৮৮৬
রাজশাহী	১,৬৫,৬০০	সিলেট	১৬০,৫০০
খুলনা	২,৩৮,৫১৭	যশোর	২,১৬,০৪০
চট্টগ্রাম	১৪,১০৩	বরিশাল	১,৭১৭
		নোয়াখালী	১,০৭,৫০০

সূত্র : ***The Dawn,*** 2 September, 1971

কিন্তু পাকিস্তানিদের এই প্রচারণা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। বরং পাকিস্তান সরকার ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। এসব কারণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৪ সেপ্টম্বর দ্বিতীয়বারের মত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।[৬৫] পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর ডাঃ মালিক ৩ অক্টোবর শরণার্থীদের ফিরে আসার আহবান জানান এবং বলেন যে, তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। তবে পাকিস্তান সরকারের পুনঃ পুনঃ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শরণার্থী ফিরে আসে নি। পাকিস্তান সরকারের হিসাব মতে ৭,৭০০ জন শরণার্থী ভারত ফিরে আসে এদের মধ্যে ২,৭৩৩ জন হচ্ছে অমুসলিম। অমুসলিমদের মধ্যে ২,৪৭১ জন শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেয় বাকীরা নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যায়।[৬৬]

পাকিস্তান অবশ্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দাবি করেছিল যে, পাকিস্তান শরণার্থী সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হলেও ভারত বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করছে।[৬৭] কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, কেন শরণার্থী নিয়ে রাজনীতি করবে ? আর শরণার্থীরাই বা কেন হানাদার অধ্যুষিত বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবে ? এর স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন শরণার্থীরা। অবর্ণনীয় কষ্ট সত্ত্বেও শরণার্থীরা জানিয়েছিল যে, তারা স্বাধীন বাংলাদেশেই ফিরতে চায়।[৬৮] শুধু তাই নয় শরণার্থীদের কাছে পাকিস্তান ছিল একটি মৃত রাষ্ট্র যে কাঠামোতে তাদের প্রত্যাবর্তন কোনভাবেই সম্ভব ছিল না।[৬৯] ১৯৭১ সালে ঢাকায় জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) এর

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা জন আর কেলী (John R. Kelly) জাতিসংঘের কাছে সুপারিশ করেন যে, শরণার্থীদের ফিরে আসার কোন পরিবেশ নেই।[৭০] সুতরাং বাস্তুচ্যুত বাঙালিদের কাছে হানাদার অধ্যুষিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে স্বাধীনতা অর্জনই ছিল মুখ্য বিষয়।

বৃহৎ শক্তি ও শরণার্থী সমস্যা

বৃহৎ শক্তি যেমন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিট্রেন, চীন প্রভৃতি দেশ নানাভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অবশ্য বৃহৎ শক্তিগুলো শরণার্থী সমস্যাকে তাদের সামগ্রিক পররাষ্ট্র নীতির অংশ হিসেবেই বিবেচনা করে এবং এ লক্ষেই তাদের কূটনীতি পরিচালিত হয়েছিল। এখানে তা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলঃ

যুক্তরাষ্ট্র ঃসরকারিভাবে নিক্সন প্রশাসন উপমহাদেশে তাদের ভূ-রাজনীতিকেই প্রাধান্য দেয়। হেনরী কিসিঞ্জার এ নীতির যৌক্তিকতা বর্ণনা করে লিখেছেন, "ভূ-রাজনীতি বলতে আমরা বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষার কথাই বুঝাতে চাচ্ছি।" সে সময় মার্কিন রাজনীতি ও কূটনৈতির অন্যতম কুশীলব কিসিঞ্জার জানিয়েছেন যে, উপমহাদেশে মার্কিন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁকে এবং নিক্সনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সসহ মার্কিন প্রশাসনের একাংশ (কংগ্রেস) এবং গণমাধ্যমের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়েছে।[৭১] এর অবশ্য কারণও ছিল। নিক্সন ছিলেন রিপাবলিকান, কিন্তু কংগ্রেসের উভয়কক্ষে ডেমোক্র্যাটরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোটামুটিভাবে ডেমোক্র্যাট দল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। ফলে দেখা যায় যে, এপ্রিলের প্রথমদিনেই দুজন সিনেটর ম্যাসাচুয়েটসের এডওয়ার্ড কেনেডি এবং ওকলাহোমার ফেড হ্যারিস বাংলাদেশ সমস্যার উপর বক্তব্য রাখেন। রক্তপাত বন্ধ করা ও শরণার্থীদের সাহায্য প্রদানই ছিল তাদের দাবি।[৭২] ১৮ এপ্রিল ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন যে, "পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী বিশ্বের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে গন্য করা যায়না।"[৭৩]

অবশ্য জনসমক্ষে প্রচার করা হচ্ছিল যে, নিক্সন সবসময়ই নিরপেক্ষ মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সাংবাদিক এণ্ডারসনের ফাঁস করা তথ্যে জানা যায় যে, মার্কিন নীতিতে পাকিস্তান ঘেঁষা প্রবণতা আছে এবং পুরোমাত্রাই বিদ্যমান ছিল। মার্কিন জনগণ মনে করেন যে, 'মানবতাবাদের" চেয়ে ভূ-রাজনীতি তাদের কাছে অধিকতর পচ্ছন্দের বিষয়।[৭৪] তবে জনমতের চাপে নিক্সন প্রশাসন শরণার্থীদের জন্যে সরকারিভাবে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করে এবং ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গে জামায়েত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্থানান্তরের জন্যে পরিবহন বিমান সরবরাহ করে। জুন মাসে মার্কিন বিমান বাহিনীর ৪টি পরিবহন বিমান ত্রিপুরা থেকে শরণার্থীদের স্থানান্তর শুরু করে।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, সিনেটে শরণার্থী বিষয়ে একটি সাব কমিটি গঠিত হয় এবং এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এডয়ার্ড কেনেডী। তিনি ১৯৭১ সালের ৩ মে সিনেটে প্রদত্ত এক সুদীর্ঘ ভাষণে বাংলাদেশের শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যদানের আবেদন জানান।[৭৬]

তৃতীয়ত, এডয়ার্ড কেনেডী আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারত সফর করেন এবং পাঁচদিন পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে শরণার্থী শিবিরগুলোতে পরিদর্শন শেষে তাদের অবস্থাকে সে সময়ের সর্ববৃহৎ 'মানবিক ট্র্যাজিডি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ২৬ আগষ্ট ১৯৭১ ওয়াশিংটন জাতীয় প্রেসক্লাবে কেনেডী একটি দীর্ঘ ও স্মরণীয় বিবৃতি পাঠ করেন। তার বিবৃতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেন।[৭৭] ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে কেনেডী আরো বলেন যে, শরণার্থী ব্যয় বহনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে উন্নত বিশ্বকে আরো এগিয়ে আসা উচিত। সর্বোপরি সমস্যা সমাধানের জন্যে বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসন বন্ধেরও তিনি দাবি জানান।[৭৮]

চতুর্থত, মার্কিন সাহায্যে যাতে পর্যাপ্ত হয় সেজন্যে ২৩ সেপ্টম্বর সিনেটর কেনেডী ত্রাণকাজের জন্যে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ চেয়ে বিল উত্থাপণ করেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তখন সঙ্গে সঙ্গে ২৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বরাদ্দই বহাল থাকে।[৭৯]

পঞ্চমত, সাধারণভাবে রিপাবলিকান সদস্যদের মনোভাব ডেমোক্র্যাটদের তুলনায় রক্ষণশীল ছিল। রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান পিটার এইচ. ভি ফ্রিলিং হুসেন (Peter H.B. Freling Heusen) ২ অক্টোবর কুমিল্লায় পাকিস্তান সরকার স্থাপিত শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং পরদিন ঢাকায় বলেন, "ভারত যদি জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক গ্রহন করে তবে উত্তেজনা কমবে।"[৮০] আরেকজন রিপাবলিকান সিনেটর রবার্ট ডোলে (Robert Dole) ৭ অক্টোম্বর সিনেটে বক্তৃতাকালে কেনেডী উত্থাপিত শরণার্থী সাহায্যদান সংক্রান্ত বিলের সমালোচনা করেন।[৮১]

সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ ১৯৭১ এ বাংলাদেশ সংকটে সোভিয়েত ইউনিয়ন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মতাদর্শের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে (National Interset) প্রাধান্য দিয়েছিল। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্ণি- ২ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে লেখা এক পত্রে 'পূর্ব পাকিস্তানে' নির্যাতন বন্ধ করে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর আহবান জানান। অর্থাৎ পদগর্ণি বাংলাদেশ বা পূর্ব বাংলা না বলে বলেছেন 'পূর্বপাকিস্তান'।[৮২] প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সোভিয়েত নীতি বিশ্লেষন করে লিখেছেন, "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

রুশনীতি সুবিধাবাদী ছিল এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শুধুমাত্র কৌশলগত বাংলাদেশী প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়।[৮৩] এ উপসংহারের সাথে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যায় না । এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ৯ আগষ্ট সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর রুশ নীতিতে বাংলাদেশপন্থী প্রবনতা স্পষ্ট হতে থাকে। অক্টোবরের শুরুতে মস্কো প্রকাশ্যে বলল 'পূর্ববাংলা'। একই সময় জাতিসংঘ ২৬ তম অধিবেশনে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রেমিকো বললেন, বাংলাদেশের ঘটনাবলী 'অভ্যন্তরীণ সংকট' নয়।[৮৪]

অবশ্য জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি মস্কো বরাবরই বড় করে দেখেছে। ঢাকার পতন যখন আসন্ন হয়ে উঠে তখন উপপ্রধানমন্ত্রী ভাসিলি কুজনেতসভ দিল্লী আসেন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃতি যেন মস্কোপন্থী হয় তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৮৫]

সোভিয়েত সরকার ও জনগণ শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যদানে এগিয়ে আসে। প্রাথমিক অবস্থায় শরণার্থীদের ভারত যে সাহায্য দেয়, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অপর্যাপ্ত ছিল। শুধু তাই নয় শরণার্থীদের চাপে ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এই বিপর্যয় রোধে সোভিয়েত জনগণ খাদ্য, ঔষধপত্র, কাপড় ইত্যাদি জরুরি দ্রব্যাদি নিয়ে ভারত সরকারকে সাহায্যে এগিয়ে আসে।[৮৬] শরণার্থী ব্যবস্থাপণায় ভারত সরকারের পরিকল্পিত উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্রুত সাড়া দেয় এবং বেশ কিছু পরিবহন বিমান সরবরাহ করে। ১৫ জুন এরোফ্লাটের বিমানগুলো পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য স্থান থেকে শরণার্থীদের মধ্যপ্রদেশে স্থানান্তরের জন্যে ফ্লাইট শুরু করে।[৮৭]

১৯৭১-এ চীন-মার্কিন অভূতপূর্ব আতাঁতের মুখে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রবক্তা ভারত নিসঙ্গ হয়ে যায়। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে দ্বিধা ও এড়িয়ে চলার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় ভারতের প্রতি রুশ সমর্থন ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। ডিসেম্বরের চূড়ান্ত পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিন তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ বিরোধী প্রস্তাবসমূহ, ব্যর্থ করে দেয়।

সরকারি ভূমিকার চেয়ে বেসরকারি ভূমিকা আরো উজ্জ্বল ছিল। সোভিয়েত পত্রপত্রিকা, শান্তি কমিটি, নারী কমিটি, রেডক্রস, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, শিশুদের সংগঠন, পাইনিওর অর্গানাইজেশন, যুব সংগঠন কমসোমলস্কায়া ইত্যাদি শরণার্থীদের সাহায্যদানে এগিয়ে আসে। যেমন লেলিনগ্রাদে ক্রাস নোগভারদেয়েৎস-এর ফার্ম-এর শ্রমিকদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বলা হয় "আমরা দাবি জানাচ্ছি যে, পাকিস্তান সরকার

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিকামী জনগনের উপর যে বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছে তা বন্ধ করুক যাতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী স্বদেশে ফিরে যেতে পারে।"[৮৯]

ব্রিটেন ঃ সরকারিভাবে ব্রিটেন সাবধানী নীতি অনুসরণ করে এবং এ নীতি ছিল অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। যদিও মানবিক বিষয়ে উদ্বেগ বরাবরই ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম এক বিবৃতিতে বলেন যে, ব্রিটেন পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে।[৯০] এছাড়া ব্রিটিশ সরকার ভারতে বাঙালি শরণার্থীদের জন্যে ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেয়।

২১ জুন ব্রিটেন পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে 'Aid Pakistan Consortium' এর বৈঠকে অন্য দশটি দেশের সাথে পাকিস্তানকে নতুন করে সাহায্য দানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।[৯১]

বেসরকারিকভাবে ব্রিটেনের পত্রপত্রিকা, এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া মুক্তিযুদ্ধকে অকুণ্ঠ সমর্থনদানে এগিয়ে আসে। OXFAM এর কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। ঢাকায় বেসরকারি সংস্থাগুলোও জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতার সাথে OXFAM জড়িত হয়।[৯২]

চীন ঃ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চীন জাতীয় স্বার্থের কারণে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। ফলে দেশটি শরণার্থী সমস্যা কিংবা বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রামের কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় চীন সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন করে। যেমন ২১ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে বক্তৃতাদানকালে চীনা প্রতিনিধি পাকিস্তানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে বলেন, "ভারত তথাকথিত তিব্বতী শরণার্থী নিয়ে চীনের সাথে যে রকম আচরণ করেছে একই রকম আচরণ করেছে বাঙালি শরণার্থী নিয়ে।"[৯৩]

শরণার্থী সমস্যা ও জাতিসংঘ বিভিন্ন সংস্থা

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে যাবার ৪৮ ঘন্টা পর মহাসচিব উথান্ট জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগাশাহীর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয়ে ঢাকার পরিস্থিতি ও মানবিক বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[৯৪] ২৯ মার্চ জাতিসংঘে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমরসেন উথান্টের সাথে দেখা করে উপমহাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। এ প্রেক্ষিতে পরদিন (৩০ মার্চ) সমরসেনের কাছে লেখা এক আনুষ্ঠানিক (Verbal Note) পত্রে উথান্ট জানান যে, "Both from

Dhaka University Institutional Repository

personal conviction and as a Secretary General of the United Nations, I am never neutral on humantraian issue." একই পত্রে উথান্ট দুটো প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেন। ক. সঠিক তথ্যাদির অভাব এবং খ. বিভিন্ন দেশের সরকার দাবি করে যে, মহাসচিব কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।[৯৫] একই দিন (৩০ মার্চ) উথান্টের পত্রের জবাবে সমরসেন একটি অনানুষ্ঠানিক (Not offical) পত্রে যুক্তি দেখান যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একটি গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া উচিত। তিনি বলেন, 'মানবিক বিপর্যয়ের' মাত্রার ব্যাপকতা বিচার করলে দেখা যাবে যে, এটি এখন আর পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ বিষয়' নয়।[৯৬]

এই পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ মহাসচিব অপ্রকাশ্যে পাকিস্তান, ভারত এবং অন্যান্য আগ্রহী দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ১ এপ্রিল জাতিসংঘ সহায়তার প্রস্তাব দেন। মহাসচিবের এই তৎপরতার খবর জানার জন্যে সাংবাদিকদের চাপের মুখে তাঁর মুখপাত্র মহাসচিবের অনুমতি নিয়ে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

> If the government of Pakistan were to request the Secretary-General to assists in humanitarian efforts, he would be happy to do everything in his power in this regard. Of course, the Secretary-General is very much concerned about the loss of life and human suffering from the recent development in Pakistan."[৯৭]

পাকিস্তান তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। ৭ এপ্রিল জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগাশাহী একটি অনানুষ্ঠানিক পত্রে (Verbal note) জাতিসংঘ সনদের আর্টিকেল ২(৭) লঙ্ঘনের জন্যে জাতিসংঘ মহাসচিবকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখণ্ডতাকে বিনাশ করার ভারতীয় বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আগাশাহী প্রমাণ হিসাবে ভারতীয় সংসদে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রস্তাব গ্রহনের বিষয়টি উল্লেখ করেন।[৯৮]

পাকিস্তানের সরাসরি প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও মহাসচিব ২২ এপ্রিল দ্বিতীয়বারের মত, মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পত্র লিখেন। এ পত্রের পুরো বক্তব্য ১২ মে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। এতে মহাসচিব 'পূর্ব পাকিস্তান' পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি ইয়াহিয়াকে জানান যে, ২৫ মার্চের'ক্রেকডাউনের' পর ঢাকা থেকে জাতিসংঘের যে সকল কর্মকর্তা ফেরত এসেছেন তাদের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তিনি সনদের আর্টিকেল

Dhaka University Institutional Repository

২(৭) ধারা সম্পর্কে তার আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যে, ভবিষ্যতেও এ ধারা সমুন্নত রাখতে কাজ করে যাবেন। তবে জাতিসংঘের কাঠামোতে মানবাধিকারের যে নীতিমালা রয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টির প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ইয়াহিয়াকে জানান যে, পাকিস্তানের সম্মতি পেলে জাতিসংঘ এবং তার বিশেষায়িত সংস্থাগুলো একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।তিনি আরও জানান যে, সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে দুর্গতি ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তার সহায়তায় জাতিসংঘ ভূমিকা রাখতে পারে।[৯৯]

২৩ এপ্রিল সমরসেন মহাসচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে সর্বপ্রথম ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শরণার্থীদের জন্যে জাতিসংঘ সহায়তা কামনা করেন।[১০০] সমরসেন ১২ মে জাতিসংঘে ভারতে আশ্রয়গ্রহনকারী বাঙালি শরণার্থীদের একটি পরিসংখ্যান দেন। তিনি জানান যে, ১৫৬টি ক্যাম্পে ৭,৩৮,৪৩১ জন শরণার্থী রয়েছে এবং আরো ৭,৪২,৬৭০ জন ক্যাম্পের বাইরে রয়েছে। তিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ মহাসচিব এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থাগুলোকে সাহায্য প্রদানের আহ্বান জানান।[১০১] সমরসেনের এ অনুরোধের পর জাতিসংঘ মহাসচিব ১৯ মে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের কাছে শরণার্থীদের সাহায্যদানের আবেদন জানান।[১০২] মহাসচিবের এ আবেদনের পর পূর্ববাংলা সংকট আন্তর্জাতিক রূপ নেয়।

১৬ জুন মহাসচিব পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে বিশ্ববাসীর কাছে দ্বিতীয় আবেদন করেন। এতে বলা হয়, "পাকিস্তান সরকার ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ মনে করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সামগ্রীর জরুরি প্রয়োজন এবং ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্যে পরিবহন দরকার"। তিনি বলেন, ভারত ও পাকিস্তানে সাহায্য প্রদান দুটো স্বতন্ত্র পরিকল্পনা এবং উভয় পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি সংযোগ রয়েছে- সেটি হলো পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি উন্নত হলে ভারতে শরণার্থী আগমনের স্রোত বন্ধ হবে"।[১০৩] মহাসচিবের এ আশাবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ ভারতে শরণার্থীদের আশ্রয়গ্রহন কখনই বন্ধ হয়নি (বিভিন্ন সারণি দ্রষ্টব্য)।

সরেজমিনে শরণার্থী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনের জন্যে শরনার্থী সংস্থার প্রধান (UNHCR) সদরুদ্দিন আগাখান জুন মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন। ১২ জুন তিনি চুয়াডাঙ্গা ও বেনাপোলে পাকিস্তান সরকার স্থাপিত দুটো ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেন।[১০৪] এসব ক্যাম্পগুলো ছিল অনেকটা সাজানো এবং এগুলোছিল সামরিক জান্তার প্রতারণামূলক কৌশলের অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সফর শেষে ১৫ জুন কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে সংবাদিকরা সদরুদ্দিনকে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন যে, রাজনৈতিক সমাধান বলতে অনেক কিছুই বুঝায়। শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে UNHCR এর সুপারিশ কি জানতে চইলে তিনি বলেন, এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি UNHCR -এর কাজ নয়। বিষয়টি রাজনৈতিক এবং UNHCR এর এখতিয়ার বহির্ভূত।[১০৫] ১৯৭১- এ সদরুদ্দিনের সহকর্মী ও অধীনস্থ কর্মকর্তা জন আর কেলী সদরুদ্দিনের ইতিবাচক কর্মকান্ডের বিষয়টি বারবার উল্লেখ করেছেন।[১০৬]

সদরুদ্দিন ও জন আর কেলীর ভাষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের কাজে উৎসাহ উদ্দীপণা ছিল। কিন্তু তড়িৎ কোন সমাধান তারা দিতে পারেন নি। যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কোন এখতিয়ার ছিলনা। তাই সমাধান বা সাফল্যের প্রশ্নটি অবান্তর। যদিও মানবিক কার্যক্রমের ছত্মাবরণে পাকিস্তানের প্রতি পক্ষাবলম্বনের অভিযোগ ওঠেছিল সদরুদ্দিনের বিরুদ্ধে।[১০৭] অবশ্য সদরুদ্দিন নিজের অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দেখান যে, "আমি পাকিস্তানি নই। আমি ইরানী ও শরণার্থী সমর্থক।"[১০৮]

ভারত পাকিস্তান সফর শেষে সদরুদ্দিনের ২৩ জুন জেনেভায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "রাজনৈতিক সমাধানই শরণার্থীদের মনে প্রকৃত আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে পারে।"[১০৯] জাতিসংঘের একজন শীর্ষ কর্মকতা যিনি সরেজমিনে ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে এই স্বীকারোক্তি করেন। তথাপি জাতিসংঘ পরবর্তী মাসগুলোতে গ্রহনযোগ্য কোন সমাধানের উদ্যোগ নেয় নি।

ভারত ও পাকিস্তানে জাতিসংঘের এজেন্সীসমূহের ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয় করার জন্যে সংস্থাটির ইতিহাসে প্রথম বারের মত জেনেভায় একটি নির্বাহী সংস্থা (Standing Committee) গঠন করা হয়। [১১০] ভারত প্রথম দিকে আপত্তি করলেও পরে তা মেনে নেয়।

জেনেভায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) -এর ৫১ তম অধিবেশনে শরণার্থী প্রসঙ্গ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ -(ECOSOC)-এর গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন ৫ জুলাই ১৯৭১ সংস্থাটির সদর দপ্তর জেনেভায় আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী ভাষণে জাতিসংঘ মহাসচিব ভারত ও পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতায় বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে আবেদন জানান। অধিবেশনে নিউজিল্যান্ড ও যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি শরণার্থী বিষয়ে আলোচনার জন্যে উদ্যোগ নেন।[১১১] ঐ অধিবেশনে জাতিসংঘের আন্তঃ সংস্থা বিষয়ক সহকারী মহাসচিব ইরাকের ইসমত কিত্তানী পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে একটি বিবৃতি দেন । মিঃ কিত্তানী তার বিবৃতিতে বেশ কিছু সুপারিশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ক. পূর্ব পাকিস্তানে সড়ক ও রেলপথ ব্যবস্থা অনেকাংশে ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে নৌযানের মাধ্যমে খাদ্য ও ত্রাণ পৌঁছাতে হবে।

খ. পাকিস্তান সরকারের একটি কমিটির সাথে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ((FAO), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), ইউনিসেফ (UNICEF) যৌথভাবে পূর্ব পাকিস্তানে একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার কাজ করছে।

গ. খাদ্য সাহায্য হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান ২ কোটি ৮২ লক্ষ ডলার প্রয়োজন।[১১২]

কিন্তানীর ঐ বক্তব্য মোটামুটিভাবে পাকিস্তানপন্থী। কারণ ঐ সুপারিশের মাধ্যমে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে দখলীকৃত বাংলাদেশে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞকে আড়াল করা হয়েছে। কারণ তিনি যেসব প্রস্তাবনা দিয়েছেন তা কেবল একটি দেশের স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু পূর্ব বাংলায় সে সময়ের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। একই অধিবেশনে ভারতীয় পর্যবেক্ষক দলের নেতা এন কৃষ্ণন তার দেশের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ক. জুন মাসে শরণার্থীর সংখ্যা ৬৩ লাখে পৌঁছেছে।

খ. ঔষধ, খাদ্য ও অন্যান্য খাতে ভারত সরকার ৮ কোটি রূপি ব্যয় করেছে। এজন্যে ভারত সরকারকে ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত করারোপ করতে হয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসা উচিত।

গ. শরণার্থীদের সাহায্যের বিষয়টি একটি সাময়িক ব্যবস্থাই হবে। তাদের স্থায়ীভাবে নিজ আবাসভূমে প্রত্যাবর্তনের স্বাধীনতা ও গ্যারান্টি দিতে হবে।[১১৩]

নিউজল্যান্ডের প্রতিনিধি জে ভি স্কট ((J.V Scot) ১৬ জুলাই একটি বাস্তবধর্মী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সীর কাজের প্রশংসা করেও হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন এই বলে "This is not a situation from which the international community dare to turn way eyes." মিঃ স্কট শরণার্থী বিষয়ে ভারতের দেয়া পরিসংখ্যানকেও সমর্থন করেন। শরণার্থী সমস্যার সমাধান প্রশ্নে তিনি বলেন যে, নিউজল্যান্ড মনে করে হতভাগ্য শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধানে পৌঁছা

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন। কোন নীল নকসা সমাধান নয়। তিনি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান বলতে রাজনৈতিক সমাধানকে বুঝিয়েছেন। কারণ তার ব্যাখ্যা ছিল নিজেদের সমাজে একজন নাগরিক হিসেবে জীবন যাপনের নিশ্চয়তাই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।"[১১৪] একই দিন যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি এল মসজব ((L. Mojsov) তাঁর বিবৃতিতে বলেন যে, এত সংক্ষিপ্ত সময়ে বিপুল শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ নিয়ে তার দেশের প্রেসিডেন্ট যোশেফ বি, টিটো উদ্বিগ্ন এবং তিনি দুটো প্রস্তাব দেন।

এক. শরণার্থী সমস্যার একটি স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান প্রয়োজন;

দুই. শরণার্থীদের ইচ্ছা অনুযায়ী সমাধান বের করে আনা উচিত।[১১৫]

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) এর প্রধান সদরুদ্দিন আগাখান রিপোর্টে দেন যে, ভারতে শরণার্থীদের জন্যে আরো ব্যাপক সাহায্য প্রয়োজন। তিনি আরে বলেন যে, সংকট মোকাবিলায় সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪০ কোটি ডলার প্রয়োজন। এবং এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মজুরী, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ ডলার পাওয়া গেছে। শরণার্থী শিবিরগুলোতে কলেরার টিকা ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তরের বিবরণ দেন সদরুদ্দিন।[১১৬]

এই অধিবেশনে সোভিয়েত, নরওয়ে, ব্রিটেন, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ শরণার্থী সমস্যা সমাধানের উপর মতামত পেশ করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ১১ দিন ব্যাপী বির্তক ও আলোচনার পর ১৬ জুলাই ভারতীয় উপমহাদেশে জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমকে অনুমোদন করা হয়। এ অনুমোদনের মাধ্যমে দুটো স্বতন্ত্র ত্রাণ কার্যক্রমকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ত্রাণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয় ভারতে বাঙালি শরণার্থীদের নিয়ে এবং এটি তত্ত্বাবধায়ন করে শরণার্থী সংস্থা (UNHCR)। অন্যদিকে তুলনামূলক ক্ষুদ্র ত্রাণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয় পূর্ব পাকিস্তানে একজন আবাসিক প্রতিনিধির নেতৃত্বে।[১১৭]

জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব ও বিতর্ক

জাতিসংঘ মহাসচিব ১৯ জুলাই জাতিসংঘে ভারত ও পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিদ্বয়ের কাছে প্রস্তাব করেন যে, সীমান্তের দুই প্রান্তে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন তদারকি করার জন্যে (UNHCR) -এর প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা প্রয়োজন। মহাসচিব সীমিত আকারে এই ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে এবং

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের দুই বা তিনটি স্থান নির্বাচন করে কাজ শুরু করার কথা বলেন। প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য মানবিক মনে হলেও এর রাজনৈতিক, আইনগত ও সামরিক গুরুত্ব ছিল অনেক। পাকিস্তান সরকার আনন্দের সাথে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু ভারত প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, ভারত শরণার্থীদের ফেরত যেতে বাঁধা দিচ্ছেনা।[১১৮]

মুজিবনগর সরকারও জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি দৃঢ়ভাবে বাতিল করে দেয়।[১১৯] *জয়বাংলা* ও *মুক্তিযুদ্ধ* আরো কঠোরভাবে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের উদ্যোগের নিন্দা করে।[১২০]

পূর্ব বাংলায় জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতা

পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) জাতিসংঘের সাহায্য প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রথমদিকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি বরং এ ধরণের উদ্যোগকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করে।[১২১] সে সময় ঢাকায় দায়িত্ব পালনকারী পাকিস্তানি আমলা যিনি ত্রাণ, পুনর্বাসন ও বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমন্বয় করতেন সেই হাসান জহির স্বীকার করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সংকট আন্তর্জাতিক রূপ নেবে এই আশঙ্কায় ইয়াহিয়া খান প্রথম দিকে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ত্রাণ কার্যক্রমকে অনুমতি দেননি।[১২২] কিন্তু ইয়াহিয়া খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মীর্জা মোজাফফর আহমেদ ১৭ মে জাতিসংঘ মহাসচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বহির্বিশ্বের কূটনৈতিক চাপ এবং দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির মুখে ইয়াহিয়ার নীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন হয়। ১৯৭১-৭২ সালে ২০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি অনুমান করা হয়। ১৯৭০ এর প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছাস ও মুক্তিযুদ্ধের কারণে কৃষি ফ্রন্টের ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশী। পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজেও খাদ্য শস্য বিনষ্ট হয়। মেহনতি মানুষ শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন চিত্তে ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয় নি। এবং অনেকেই ক্ষেতের ফসল রেখে পালিয়ে যায়।[১২৩] কাজেই সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। এজন্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিচালিত হয় *UNEPRO (United Nations East Pakistan Relief Operation)*।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করার জন্যে ১৯৭১ সালের ২৮ জুলাই UNHCR-এর প্রতিনিধি হিসেবে জন আর কেলী ঢাকায় আসেন।[১২৪] তার কাজ ছিল জাতিসংঘের আরেকটি বিশেষায়িত সংস্থা ইউএনডিপি (UNDP) এর কাজের সাথে সমন্বয় সাধন। ২ আগষ্ট UNEPRO-তে কাজ করার জন্যে একটি রিলিফ টিম গঠনের কথা জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা দেয়া হয়।[১২৫] এ দলটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, এদের কাজ হবে 'সম্পূর্ণ ত্রাণ তৎপরতা বিষয়ক' এবং এরা 'শান্তিরক্ষক' বা 'পর্যবেক্ষক' হিসেবে কাজ করবেন না।[১২৬]

জন কেলীর দায়িত্ব গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক রিলিফ টিম গঠনের পর পূর্ব বাংলায় জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সীর কর্মচারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। আগষ্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহাসচিব স্বয়ং পূর্ব বাংলায় জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেছেন। এবং এ বিষয়ে তাকে সহায়তা করেছেন সহকারী মহাসচিব (বিশেষ রাজনীতি বিষয়ক) রবার্টো গায়ার এবং আন্তঃসংস্থা বিষয়ক সহকারী মহাসচিব ইসমত কিত্তানী। কিন্তু কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় একজন সার্বক্ষনিক কর্মকর্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই ২৩ আগষ্ট ফরাসী পররাষ্ট্র বিভাগের চৌকষ কর্মকর্তা পল মার্ক হেনরীকে (Paul Mark Henry) সহকারী মহাসচিবের পদমর্যাদায় UNEPRO এর প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর ৩ সেপ্টেম্বর হেনরী ঢাকা আসেন এবং রিলিফ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন।[১২৭]

জাতিসংঘের সাহায্য ও বাস্তব পরিস্থিতি

সদর দফতরের পরিকল্পনা ও সক্রিয়তা সত্ত্বেও জাতিসংঘের ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাহায্য ক্ষুধার্ত মানুষ ও ভুক্তভোগীদের হাতে খুব কমই পৌঁছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার যানবাহন অনেকক্ষেত্রে পাকিস্তানিরা নিজেদের সামরিক কাজে ব্যবহার করে। প্রত্যক্ষদর্শী ফাদার টিম সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রমের যে চিত্র দিয়াছেন, তাতে জাতিসংঘের কাগজ কলমে প্রণীত পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। টিম লিখেছেন,

> all 400 UNICEF vehicles had been seized by the Army and only about 48 recovered. UNICEF was bringing in more vehicles-rather than facing Pakistan to return their. ..In next week I spotted two more UNICEF vehicles with their insignia rubbed out and a UN jeep full of armed soldiers which stopped at Firm Gate to let the soldiers out. This was completely contrary to the UN agreement, which would not allow armed protection for UN relief distribution.[১২৮]

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শুধু জাতিসংঘের যানবাহনই দখল করে নি জাতিসংঘের ত্রাণ সামগ্রীও বিভিন্ন সময় ছিনিয়ে নিয়েছে। ৬ অক্টোবর ফাদার টিম লিখেছেন, "Last month when I was in Barisal there

Dhaka University Institutional Repository

was a UN boat with food grains where unloaded by the army." একই অভিযোগ করেছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর) এর মুখপত্র *জয়বাংলা*।[১২৯]

পরবর্তী মাসগুলোতে অবস্থার আরো অবনতি হয়। তখন সেনাবাহিনী ছাড়াও তাদের বাঙালী সহযোগী 'শান্তিকমিটি' এবং 'রাজাকার' বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ ত্রাণ সামগ্রী আত্মসাৎ করতে থাকে। এরা কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ব্যবসাও খুলে বসে। ফাদার টিম লিখেছেন, "We have two reports of Razakars doing business in food and the Bengali's are still getting nothing, as of last week."[১৩০] শুধু জাতিসংঘ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রেই বাধা আসেনি - অন্যান্য আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে একই অবস্থা হয়েছে। ব্রিটেনের মানবদরদী কিছু ব্যক্তি ও সংস্থার উদ্যোগে অপারেশন ওমেগা (Operation Omega) সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে। এই ত্রাণকর্মীদের উদ্যোগ শুধু ব্যর্থই হয়নি তাদেরকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কারারুদ্ধও করে।[১৩১]

জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে এ ধরণের প্রহসনমূলক ঘটনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে বিক্ষুব্ধ করে। তিনি ৫ সেপ্টেম্বর এক বেতার ভাষণে স্পষ্ট করে বলেন,

> বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যে সাহায্য দিয়েছে পাকিস্তানের মাধ্যমে তা দখলীকৃত এলাকায় বিলি করার ব্যবস্থা সঙ্গত মনে করছে জাতিসংঘ। বিগত ঘূর্ণিঝড়ের পরে রিলিফের জন্যে যেসব হেলিকপ্টার ও অন্যান্য যানবাহন এসেছিল, বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধেই পাকিস্তান সরকার নির্বিকার চিত্তে ব্যবহার করছে। দুর্গত মানুষের জন্য নির্দিষ্ট বহু সামগ্রী দখলদার সৈন্যদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতিসংঘের সেনাদলে এখন একদল যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এসেছেন উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়ে, এতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রণকৌশলে সাহায্য হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় ত্রাণ কার্যে মানবতাবাদী উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হওয়ার ঘোরতর আশংকা রয়েছে। জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল যদি পৃথিবীর এই অংশে বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে চান, তাহলে তাকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ত্রাণ কার্যক্রমের নামে নিষ্ঠুর প্রহসন অনুষ্ঠিত না হয়।[১৩২]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের এসব অভিযোগ যে অমূলক ছিল না তা প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশীদের বিবরণ ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টসমূহ বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো জাতিসংঘের ত্রাণকার্যক্রমে এই দুর্গতি হলো কেন? এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। *NEW*

Dhaka University Institutional Repository

YORKS TIMES নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি এক রিপোর্টে এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করেছিল। এতে বলা হয়,

> Once the supply reach the final depots, responsibility of Foreign Relief Organizations ends and distribution is handed by the army as its political reliable "peace committees" subject only to occasional spot checks by UN officials. It is widely charged that many army is using the aid more as a political lever than for generally humanitarian purposes withhold it from rebel areas.[১৩৩]

অর্থাৎ জাতিসংঘ কর্মকর্তারা কয়েকটি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা ছাড়া কিছু করতে পারে নি। তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও জড়িত ছিল। তদুপরি একাধিক সমস্যা ছিল তাদের। প্রথমত, জাতিসংঘ কর্মকর্তা ও কর্মীগণ স্থানীয় ভাষা জানতেন না। ফলে তাদেরকে পাক সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, একটা ভীতি ছিল সবসময়। ফলে মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ছিল অনেক। তৃতীয়ত, জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতাকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে।[১৩৪]

জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ তৎপর হয়ে উঠে এবং একটি শক্তিশালী অবস্থান নেয়। ফাদার টিমের ভাষ্য অনুযায়ী, "I think that the UN is gradually making itself."[১৩৫] নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ পাকিস্তান সরকারের সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং এখানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। চুক্তি অনুযায়ী ত্রাণকর্মীরা অবাধে পূর্ব বাংলায় প্রবেশ ও চলাচলের অধিকার অর্জন করেন। চুক্তিতে ত্রাণ তৎপরতাকে সম্পূর্ণ 'মানবিক' বলে বর্ণনা করা হয়।[১৩৬]

ইউনিসেফ - কেয়ার যৌথ সাহায্য ঃ সাফল্যের দৃষ্টান্ত

ঢাকায় ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে বেসরকারিভাবে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে মানবিক সাহায্য প্রকৃত দাবীদাররাই পেয়েছে বলেই তথ্যাদি পাওয়া যায়। যেমন 'ইউনিসেফ-কেয়ার শিশু খাদ্য কর্মসূচী' সামরিক জান্তার হস্তক্ষেপ মুক্ত ছিল। এরকম একটি কর্মসূচীর বিবরণ দিয়েছেন ফাদার টিম। তারা পাক সরকারের সাথে লিখিতভাবে চুক্তি করেন যে, কেবলমাত্র স্কুলে উপস্থিতির

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতেই সাহায্য দেয়া হবে না বরং যারা অনুপস্থিত তাদেরকেও সাহায্য দেয়া হবে। অনুপস্থিত যারা ছিল তাদের প্রায় সবাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বাবা মায়ের সন্তান। অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী এবং এরা ভয়ে স্কুলে আসতো না।[১৩৭]

জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) এর নির্বাহী কমিটির বৈঠক

এদিকে ৪ অক্টোবর জেনেভায় জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার নির্বাহী কমিটির বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে সদরুদ্দিন দাবি করেন যে, জাতিসংঘ শরনার্থী সংস্থা (UNHCR) এর Good Office ভূমিকা সৃষ্টি হয়েছে। সদরুদ্দিন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। এগুলো হল ঃ (ক) শুধু ভারতে শরণার্থী শিবিরে ত্রাণ চালিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; (খ) অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দুপক্ষের সম্মতি অনুযায়ী সমাধান হয়েছে। এ রকম অবস্থায় পৌঁছা না পর্যন্ত একটি প্রকৃত সমাধানে পৌঁছা সম্ভব নয়; (গ) শরনার্থদের ব্যয় নির্বাহের জন্য আরো অনেক অর্থের প্রয়োজন।[১৩৮]

সদরুদ্দিনের এই বিবৃতি তার পূর্ববর্তী বক্তৃতার চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী। এতে এটাই প্রমানিত হয় যে, বিলম্বে হলেও তিনি বাংলাদেশ সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন।

তৃতীয় কমিটির বৈঠক[১৩৯]

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩য় কমিটির বৈঠক বসে। ঐ কমিটিতে সদরুদ্দিন বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানে জাতিসংঘ সাহায্য হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে আকাশপথে অন্যতম দীর্ঘতম মানবিক সাহায্য। তিনি প্রতিদিনের ব্যয় (Recurring Costs) এবং এককালীন ব্যয় (Non Recurring Costs)-এর হিসাব বিস্তারিতভাবে তৃতীয় কমিটিতে উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি তিনি শরনার্থী সংস্থার (UNHCR)-এর বিভিন্ন পদক্ষেপেরও বিবরণ দেন। এ হিসাবের একটি বিবরণ সারণী দশ-এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩.১০

(ভারতে জাতিসংঘের পন্য সাহায্য)

বিষয়	পরিমাণ
১. খাদ্য সাহায্য	৬২৬৭ টন
২. যানবাহন	২২০০টি
৩. ঔষধ সামগ্রী (শুধু ভারতে)	৭০০ টন
৪. আশ্রয় তৈরীর জন্যে পলিথিন	৩০ লাখ শরনার্থীর

উৎস : হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র ;* ১৩ খণ্ড পৃঃ ৭৮২-৮৭

সদরুদ্দিন জাতিসংঘ শরনার্থী সংস্থা (UNHCR) এর কতকগুলো পদক্ষেপের বিবরণ দেন। এগুলো হল ঃ

এক. ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীতে শরনার্থী সংস্থার (UNHCR) এর আবাসিক প্রতিনিধির নেতৃত্বে ইউনিসেফ (UNICEF) বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় অগণিত শরনার্থী শিবিরে কাজ করছে।

দুই. সদরুদ্দিন ভারত-পাকিস্তান সফরকালে দু'দেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে তার বৈঠকের বিবরণ দেন এবং শরনার্থী শিবিরসমূহে কিভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ হচ্ছে তার সরেজমিন রিপোর্ট দেন।

তিন. ঢাকাতে জাতিসংঘ আবাসিক প্রতিনিধির নেতৃত্বে জাতিসংঘের একটি দল কাজ করছে, তারও বিবরণ দেন তিনি।

শরণার্থী সাহায্যের জন্যে ভারত বিভিন্ন মাসে যে দাবি করেছে তারও বিবরণ দেন তিনি। তিনি জানান যে, এপ্রিলে ভারত ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার দাবি করে, ২৬ জুন তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০০ কোটি ডলার এবং ২৬ অক্টোবর ভারত ৭০ কোটি মার্কিন ডলার দাবি করে। শরণার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ভারতের দাবি যে ক্রমশ বেড়েছে সদরুদ্দিনের প্রতিবেদন তারই সাক্ষ্য বহন করে। সদরুদ্দিন তার প্রতিবেদনে বলেন যে, সমস্যাটির রাজনৈতিক দিকটি বিবেচনা করা তার কাজ নয়, কেবল মানবিক বিষয়ই সংস্থার এখতিয়ারভুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়। অবশ্য তিনি পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে, উপমহাদেশে শান্তি ফিরিয়ে এনে লাখ লাখ শরনার্থীর প্রাণ বাঁচানো যায়।[১৪০]

ভারতের প্রতিনিধি সমর সেন সদরুদ্দিনের প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে দুটো মৌল বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। এগুলো হল ঃ এক. পূর্ব বাংলায় শরনার্থীদের চাপ ভারতের উপর ক্রমশ বাড়ছে। দুই. এ সংকটের উৎসভূমি হচ্ছে পূর্ববাংলা। তাই পূর্ববাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও গ্রহণযোগ্য নেতাদের মাধ্যমেই এ সংকট সমাধান সম্ভব। তৃতীয় কমিটির আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেনসহ মোট ৩১টি দেশ আলোচনায় অংশ নেয়। অধিকাংশ দেশের বক্তব্যের নির্যাস ছিল একই এবং তারা এই গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সীকে দায়িত্ব দেয়ার কথা বলেন।

সোভিয়েত প্রতিনিধি ভি এস সেফরনসূক (V.S. Safronchuk) তার বক্তব্যে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নির্যাতন বন্ধ এবং সেখানে রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানান।[১৪১] যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ডব্লিউ টি বেনেট তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করেন, (ক) উপমহাদেশের বিয়োগান্তক ঘটনা মোকাবিলায় ভারত ও পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতা হচ্ছে সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক ও উদ্ভাবনী তৎপরতা। (খ) একটি সমাধানে পৌঁছা না পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের উচিত জাতিসংঘকে সহযোগিতা করা (গ) শরনার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনই হলো সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।[১৪২] ব্রিটেনের প্রতিনিধি দু'বার বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মানবিক বিষয়ের দায়িত্ব যদিও তৃতীয় কমিটির কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নটি তৃতীয় কমিটির এখতিয়ার বহির্ভূত।[১৪৩] ব্রিটেনের প্রতিনিধির বক্তব্যে শরনার্থী সমস্যা সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নটি এসেছে যা কীনা একটি মানবিক বিষয় হলেও রাজনৈতিক প্রশ্নটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ফ্রান্সের প্রতিনিধিও দুবার বক্তব্য রাখেন এবং বলেন যে, ভারতের উদ্বিগ্ন অবস্থার প্রতি ফ্রান্সের সমবেদনা রয়েছে।[১৪৪] অন্যদিকে তিউনেসিয়া, লিবিয়া ও নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি পাকিস্তানকে সমর্থন করে বলেন, "শরনার্থী সমস্যা সম্পূর্ণ মানবিক এবং এর সাথে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া উচিত। ... পাকিস্তান একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং এটা তার অভ্যন্তরীণ বিষয়।"[১৪৫]

তৃতীয় কমিটিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধির বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কিছু দেশ যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, এবং যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টির মানবিক দিক নিয়ে বক্তব্য রাখলে রাজনৈতিক বিষয়টিও বিবেচনা করেছেন। আবার কিছু দেশ সমস্যার উৎস হিসেবে দেখেছেন রাজনৈতিক কারণকে (ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন), অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থী কিছু রাষ্ট্র যেমন তিউনেসিয়া, লিবিয়া ও নাইজেরিয়া শরনার্থী বিষয়ক আলোচনাকে দেখেছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

২২ নভেম্বর তৃতীয় কমিটিতে সর্ব সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস হয়।[১৪৬] এ প্রস্তাবের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এক. উপমহাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রমের স্বীকৃতি; দুই. পরিস্থিতির বিপজ্জনক অবনতি সম্পর্কে সতর্কতা; তিন. কমিটি নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে বিবৃতি দেয়ার কথা বলে। এগুলো হলো ঃ

(ক) শরনার্থী সমস্যায় সবাই উদ্বিগ্ন;

(খ) জাতিসংঘ কার্যক্রমে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে আহ্বান জানানো;

(গ) শরনার্থীদের নিরাপদ পরিবেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনই স্থায়ী সমাধানের একমাত্র পথ।

তৃতীয় কমিটির এ খসড়া প্রস্তাবটি ৬ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে পাস হয়।[১৪৭] এর কয়েক মিনিট পরই সাধারণ পরিষদে মহাসচিব উথান্ট এক বিবৃতিতে বলেন, সক্রিয় সংঘর্ষের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতা স্থগিত রাখা হয়েছে। কারণ সাহায্য সামগ্রী পরিবহন অসম্ভব।[১৪৮] অবশ্য ভারতে শরনার্থীদের জন্যে ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরনার্থীদের পরিসংখ্যান ও পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরনার্থীদের স্রোত থেমে থাকে নি। পরবর্তী সারনি গুলোই এর সাক্ষ্য বহন করে।

সারনি - ৩.১১

আগষ্ট মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় শরনার্থীদের আগমন

বিষয়	সংখ্যা
মোট লোক সংখ্যা	১৫,৫৯,০০০ জন
শরনার্থী	১২,২১,০৭৫ জন
শিবির সংখ্যা	৩৬টি
শিবিরবাসী	৬,৯২,১৫৪ জন
ব্যক্তিগত ব্যবস্থা	১,৫০,০০০ জন
আত্মীয়ের সাথে	৩,৮৯,৬০০ জন
রাজ্যের বাইরে প্রেরিত	২৫,৪৪০ জন
চিকিৎসা	৩৫০ জন ডাক্তার
সংরক্ষিত ব্যবস্থা	৭৫,০০০ জন
ব্যয় (আগষ্ট ১৯৭১)	৪৫ কোটি রুপি
সম্ভাব্য ব্যয়	৭ কোটি ৫০ লক্ষ

সূত্র ঃ রাজ্য সরকারের নথিপত্র ও তৎকালীন পত্র-পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

সারনি - ৩.১২

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরনার্থীদের চালচিত্র (জুন ১৯৭১ পর্যন্ত)

রাজ্য/ জেলা	শরণার্থী ক্যাম্পে	আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে
আসাম	৮১,৮০০	৬৫,৬৭৭
ত্রিপুরা	৩,৮১,৩৭৩	৩,৬৩,৪৬৪
মেঘালয়	১,৮৬,০৫২	৪৯,৩৩২
পশ্চিমবঙ্গ		
নদিয়া	২,১৪,৭৮৮	১,৭০,৯৫১
২৪ পরগনা	৫,০৩,৪৬৭	১,৭৯,২৫০
মুর্শিদাবাদ	১,৩৪,৫০৪	১৫,৪৫৩
পশ্চিম দিনাজপুর	৭,৬৩,৬৬৪	৫,১১,৫৫৫
জলপাইগুড়ি	১,৪০,৪০২	১,৬৫,০০০
কোচবিহার	১,৮৯,৭৫৫	২,১০,৮৭৫
মালদা	৯২,১৩৯	২,৫৪,৫১৩
মোট	২৭,০৭,৯৪৭	২০,২২,৫৭০

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ১৯৭১ সালের জুন মাসে এ পরিসংখ্যান তৈরী করে
দ্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) পূর্বোক্ত ৮ম খন্ড পৃঃ ৬৮৫

সারনী - ৩.১৩

১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরনার্থীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	রাজ্যের নাম	শরনার্থী ক্যাম্পের সংখ্যা	ক্যাম্পে শরনার্থী সংখ্যা	ক্যাম্পের বাইরে শরনার্থী	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পশ্চিমবঙ্গ	৪৯২	৪,৮৪৯,৭৮৬	২,৩৮৬,১৩০	৭,২৩৫,৯১৬
২।	ত্রিপুরা	২৭৬	৮৩৪,০৯৮	৫৪৭,৫৫১	১,৩৮১,৬৯৪
৩।	মেঘালয়	১৭	৫৯১,৫২০	৭৬,৪৬৬	৬৬৭,৯৮৬
৪।	আসাম	২৮	২৫৫,৬৪২	৯১,৯১৩	৩৪৭,৫৫৫
৫।	বিহার	৮	৩৬,৭৩২	-	৩৬,৭৩২
৬।	মধ্যপ্রদেশ	৩	২১৯,২৯৮	-	২১৯,২৯৮
৭।	উত্তর প্রদেশ	১	১০,১৬৯	-	১০,১৬৯
		৮২৫	৬,৭৯৭,২৪৫	৩,১০২,০৬০	৯৮৯৯৩০৫

সূত্র : ১. Bangladesh Documents, Ministry of External affairs, New Delhi, 1972 P-690
২. Keesing Contemporary Archives 1971-1972, UK 1972 P-2499

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সীর কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এই পরিসংখ্যানকে সঠিক বলে মনে করেন। কিন্তু পাকিস্তান সবসময়ই এ পরিসংখ্যানকে অস্বীকার করতো। ইয়াহিয়া শরণার্থীদের বলতেন, "এরা কলকাতার ফুটপাতবাসী।"[১৪৯] ২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান জাতিসংঘকে জানায় যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ২০,০২,৬২৩ জন শরণার্থী ভারতে চলে গেছে।[১৫০] পাকিস্তানিদের হিসেবে শরণার্থীদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেখানো হয়েছিল। যদি ধরে নেয়া যায় যে, পাকিস্তানের হিসেব সত্য, তবে সেক্ষেত্রে বিশ লাখ মানুষের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক অবস্থার চিত্রকে প্রকাশ করে না। নিরাপত্তাহীনতা জন্যে এই একটি কারণই যথেষ্ট।

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, শরণার্থী প্রশ্নে বিশ্বের বহু রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সম্পৃক্ত হয়েছিল। বিশেষ করে জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গসংস্থাগুলো শরণার্থীদের তাৎক্ষণিক মানবিক সমস্যাগুলো সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই মানবিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্যে প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত । তবে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ও অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্তার এখতিয়ারের মধ্যে তা ছিল না। অন্যদিকে ভারত চেয়েছিল যে, শরণার্থী সমস্যা আন্তর্জাতিক ইস্যু হোক এবং তাতে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত হবে এবং তা যথারীতি ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, শরণার্থীদের ৯০ শতাংশের বেশী ছিলেন হিন্দু। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। পাকিস্তানি জান্তার এ সময়ের নীতি ছিল কিছু হিন্দুদের হত্যা করে অন্যদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বসত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে ভারতে ঠেলে দেয়া। এভাবে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার বিশ শতাংশ (২০%) কে তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যার অনুপাত সমান হবে এবং পাকিস্তানি নেতারা এটাই আশা করেছিলেন। এটি একটি সনাতন ও নিকৃষ্ট সামরিক কৌশল বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীতে ইহুদি নির্যাতন এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসে বসনিয়ায় মুসলিম নির্যাতনে একই নীতির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। বর্তমান অধ্যায়ে দেখা গেছে পাকিস্তানের এই কৌশল বুমারেং হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারত এই পরিস্থিতিকে তার উপর পাকিস্তানের 'সিভিল আগ্রাসন' হিসেব চিহ্নিত করে। ভারতীয় অর্থনীতির উপর শরণার্থীদের প্রবল চাপ সেখানে কর্মরত জাতিসংঘের কর্মকর্তারাও স্বীকার করেন। ফলে হস্তক্ষেপের আইনগত যুক্তি খুঁজে পেল ভারত। তৃতীয়ত, ভারত শরণার্থীদের জন্যে কিছু আন্তর্জাতিক সাহায্যও পেয়েছে। তবে প্রয়োজনের নিরিখে তা পর্যাপ্ত ছিল না। বর্তমান অধ্যায়ের যে হিসেব দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ভারতকে তার নিজস্ব তহবিল থেকেই শরণার্থীদের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. শরণার্থীদের পরিসংখ্যানের জন্যে দেখুন ***Keesing Contemporary Archives, Vol-8, 1971-72*** (UK: Keesing Publication, 1972), এপ্রিলের পরিসংখ্যানের জন্যে P. 24685 এবং ডিসেম্বর মাসের পরিসংখ্যানের জন্যেও P. 24991 এছাড়াও দেখুন ***Bangla Desh Documents,*** (New Delhi : Ministry of External Affairs, India ;1972,)P.672 .

২. ***Basic facts about United Nations*** (New York : UN Publication, 1992) P.75

৩. জাতিসংঘের দলিলপত্র, ২৩ জুন, ১৯৭১। উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র,* ১৩ খণ্ড, (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) ১৯৮২, পৃঃ ৭৪০।

৪. আবু মোহাম্মাদ দেলোয়ার হোসেন ও আশফাক হোসেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা : আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও জাতিসংঘ" দ্রষ্টব্য *'নিবন্ধমালা'* ৯ম খণ্ড (ঢাকা : উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬) পৃঃ ৪১-৪২

৫. ফাদার টিমের সাক্ষাৎকার, ডিসেম্বর ১৯৯৭। এছাড়াও দেখুন R.W. Timm, ***Forty years in Bangladesh.*** (Dkaha : Cataitas 1995) PP. 189-90

৬. ***Encyclopedia of Britannica*** (Chicago, Encyclopedia of Britannica Inc. 1981) PP 568-72.

৭. ***Ibid*** , PP 568-72

৮. ELFAN RESS এর সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হয়েছে Encyclopedia of Britannica -য়। *পূর্বোক্ত* পৃঃ ৫৬৯-৭০।

৯. ঢাকায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সেমিনার ১০-১১ নভেম্বর ১৯৯৭-এ শরণার্থীদের অতি সাম্প্রতিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেখুন ***UDBASTU***, Issue ও December 1997 (Dhaka:1997) PP.2-3

১০. ১৯৮১ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার ৩৩ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয় যে পাকিস্তানিরা স্বল্পতম সময়ে ১৫ লাখ মানুষকে হত্যা করে।দেখুন একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় ? (ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭) পৃঃ ৯

১১. Mohammed Ayoob & K. Subrahamanyam, ***Liberation War*** (Delhi : S. Chand & Co., 1972) P.165

১২. G.W. Chowdhury ; ***India, Pakistan, Bangla Desh and Muja Pavers: Politics of Divided Subcontinent*** (New York : The Free Press, 1975) P.209

১৩. Mohammed Ayoob, ***Ibid*** P.165

১৪. R.W. Timm, ***Ibid,*** PP. 164-66

Dhaka University Institutional Repository

১৫. M. Ayoob, ***Ibid*** P. 165

১৬. R.W.Timm, ***Ibid***, 165-180

১৭. ফান্ডার টিমের ঐ সাক্ষাৎকার ।

১৮. হুমায়ুন আহমেদ, *জলন্ত অক্ষরে* (ঢাকা : কারেন্ট বুকস হাউস, ১৯৯২) পৃঃ ৬৫-৬৬

১৯. ***Lok Shoba debates 27th March,1971*** (New Delhi : Lok Sobha Secretariat 1972) PP.42-43

২০ ***Ibid*** PP.114-115

২১. Indes Malhothra, ***Indira Ghandhi : a Personal and Political Biography*** (London, Hodder & Stoughton, 1989) P.133

২২. ***The Hindustan Times*** (Delhi) 1, April 1971

২৩. ***Ibid***

২৪. বুদ্ধদেব বসু দুটো কারণ প্রদর্শন করেন, "প্রথম কারণ হচ্ছে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে । এটার অর্থ একটি কেন্দ্রীয় শাসন বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্বাধীনতার দাবীও উঠতে পারে, যা কখনই কাম্য নয়। দ্বিতীয় কারণটি প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত তা হচ্ছে পূর্ব বঙ্গের বাঙালীরা পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীরা স্বাধীনতার দাবী তুলতে পারে, যা কোন ক্রমেই কাম্য নয়"। দেখুন,সৈয়দ আলী আহসান ,*যখন সময় এল* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবস্থান, ১৯৯২) পৃঃ ৬৬

২৫. শাহরিয়ার কবির, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত", সালাহউদ্দীন আহমেদ (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃ: ২৯১

২৬. ফজলুলবারী, *একাত্তরের কলকাতা* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩) পৃ: ২২।

২৭. *দৈনিক যুগান্তর* (কলকাতা) ২ এপ্রিল, ১৯৭১

২৮. *দৈনিক আনন্দবাজার* (কলকাতা) ২ এপ্রিল, ১৯৭১

২৯. *ঐ*, ৬ মে, ১৯৭১

৩০. Mohammad Ayoob, ***Ibid*** P.169

৩১. ***Ibid*** P.170

৩২. ***The Observer*** (London), 13 June, 1971

৩৩. *আনন্দবাজার* , ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১

৩৪. *যুগান্তর*, ৬ মে, ১৯৭১

৩৫. *যুগান্তর*, ৬ মে, ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. ৫টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ হলেন আসামের শ্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী, ত্রিপুরার শ্রী নৃপেন্দ্র লাল সিংহ, বিহারের শ্রী কর্পুরী ঠাকুর, মেঘালয়ের উলিয়ামসন সংমা এবং পশ্চিম বঙ্গের শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। ঐ বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন *আনন্দবাজার*, ৯ মে, ১৯৭১

৩৭. ***The Statements,*** 17 May, 1971.

৩৮. ***The Statements,*** 17 May, 1971.

৩৯. ***The Statements,*** 17 May, 1971.

৪০. ***The Statements,*** 19 May, 1971.

৪১. Inder Malhotra ***Ibid,*** P.161.

৪২. আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা ও ভারত*,(ঢাকা : উচ্চতর সমাজবিদ্যা গবেষনা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ অক্টোবর, ১৯৯৮) পৃঃ ১০

৪৩. ***Financial Times*** (UK), 6 December, 1971

৪৪. ***Newsweek (USA)*** 6 December, 1971

৪৫. Surjit Mansingh, ***India Search for Power*** (Delhi: Sage Publication 1984) P.88.

৪৬. ***Bangladesh Documents, Ibid,*** P.93

৪৭. ১৯৭১ পরবর্তী ভারতীয় জনগনকে রেডিনিও স্ট্যাম্প, খবরের কাগজ , সিনেমার টিকিট ইত্যাদি খাতে সারচার্জ দিতে হয়েছে। দেখুন *বাংলা নামে দেশ* (কলকাতা, আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৯০) পৃঃ ৬১। পরবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে দেখুন Inder Malhotra, ***Ibid,*** P.143

৪৮. হারুন হাবীব, *মুক্তিযুদ্ধ : ডেটলাইন আগরতলা* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশণী, ১৯৯৫) পৃঃ ৬১

৪৯. দৈনিক যুগান্তর ৯ মে ১৯৭১

৫০. ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ভারতীয় জনগণের হিসাব প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায় তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মোট লোক সংখ্যা ছিল ১৫,৫৬,৮২২। দেখুন ***Manorama Year book 1971*** (Karala, Malayala Press, 1972) P. 140

৫১. হারুণ হাবীব, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬০

৫২. গঙ্গাতীরের ট্র্যাজেডি, আই ডেদোভ, *প্রাভদা*, ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১।

৫৩. ***Sunday Times*** (UK), 13 June, 1991

৫৪. *আনন্দবাজার*, ৫ জুন, ১৯৭১

৫৫. ***Sunday Times,*** 3 June, 1971

৫৬. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭) পৃ : ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. ***The Times*** (UK), 18 November, 1971। এছাড়াও কৃষ্ণনগরে শরণার্থীদের সাথে স্থানীয় লোকজনের নভেম্বর মাসে বেশ কয়েক স্থানে সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন শরণার্থীকে প্রাণ দিতে হয়। দেখুন রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশমাস* (ঢাকা ঃ কাকলী প্রকাশনী ১৯৯৭) পৃঃ ৫০৭।

৫৮. Anthony Mascarenhas , "***Why Refugee Fled*** ?" ***The Sunday Times***, 13 June, 1971

৫৯. মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জী ঃ একাত্তর* (ঢাকা ঃ পাওনিওর পাবলিকেশনস, ১৯৯১) পৃঃ ১২৫।

৬০. ***The Pakistan Observer***, 12 May, 1971

৬১. ফিরে আসা দুজন এম, এন, এ, হলেন সাতক্ষীরার এডভোকেট আব্দুল গফফর এবং নোয়াখালির ওবায়দুল্লাহ মজুমদার । এই দালালীর পুরস্কার হিসেবে ওব্যাইদুল্লাহ মজুমদার ডাঃ মালিক মন্ত্রীসভার তথ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দেখুন *দৈনিক আজাদ*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৬২. ১৭ জুন শরনর্থীর সংখ্যা ছিল ৬০ লাখ। দেখুন ***Keesing***, P.246991

৬৩. মাহমুদ হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৫৬

৬৪. *দৈনিক সংগ্রাম*, ২ জুন, ১৯৭১

৬৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৬৬. K. Sarwar Hasan (Edited), ***Pakistan Horizon*** Vol XXIV, No4, 1971 (Karachi, P.11A, 1971) P. 92

৬৭. ***Morning News*** (Dhaka) 10 October, 1971

৬৮. *প্রান্তিক*, ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১

৬৯. একটি বিদেশি পত্রিকা লিখেছিল " For Bengalis the military takeover their region spelled out the National Unity and death of Pakistani ideal" ***The Christan Science Monitor***, 29 June, 1971.

৭০. জন আর কেলির সাক্ষাৎকার *বাংলাবাজার পত্রিকা* ২২/১২/৯৬ আরো দেখুন ***New York Time***, 23 September, 1971

৭১. Henry Kissigers, ***The White House Year*** (Delhi: Vikas, 1979) P.897

৭২. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, " বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র " সালাউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত) *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৩৬১

৭৩. মাহমুদ হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১০৬ ।

৭৪. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা (ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী, ১৯৮২) পৃঃ ৬৩

৭৫. The Obseer (UK) 13 June, 1971

৭৬. A. M. A Muhit, ***Bangladesh: Emergence of a Nation*** (Dhaka : UPL (2nt Revised Edition, 1997) P. 253

Dhaka University Institutional Repository

৭৭. ফারুক চৌধরী, *যায়যায় দিন*, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

৭৮. আবুল মাল আব্দুল মুহিত *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৩৭৫

৭৯. ঐ, পৃঃ ৩৭৫

৮০. ***Morning News,*** 4 October, 1971

৮১. ***Morning News,*** 9 October, 1971

৮২. Robert Jacson, ***South Asian Crisis*** (Delhi : Vikas Publishing House, 1978) P.172

৮৩. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৪৫,৪৬

৮৪. Rafiqul Islam , ***Bangla Desh Liberation Movement : International Legal Implication*** (Dhaka : UPL , 1987) P.126

৮৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বহির্বিশ্বের ভূমিকা" সালাউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত) *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩৯২

৮৬. বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা* (ঢাকা : মৈত্রী সমিতি, ১৯৮৭) পৃ ঃ ১১

৮৭. Kissing, P. 24688

৮৮. UN Doc S/10446, S/10426

৮৯. বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩২

৯০. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন , "বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বহির্বিশ্বের ভূমিকা", *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪০০

৯১. ঐ, পৃ ঃ ৪০১

৯২. ফাদার টিমের সাক্ষাৎকার। এছাড়া অক্সফাম (Oxfam) এর সাহায্যে সম্পর্কে জাপানি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করেছেন সুকুমার বিশ্বাস তাঁর গ্রন্থে। দেখুন ***Japan and The Emergence of Bangladesh*** (Dhaka : Agami ; 1998) P. 198

৯৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

৯৪. SCOR S/ 10410, 3 December, 1971

৯৫. Tom Oliver : ***The United Nation in Bangladesh*** (Newgersy, USA : Princeton University Press, 1978) P.5

৯৬. General Assembly Documents, Para 156, 7 December 1971

৯৭. Tom Oliver, ***Ibid,*** P. 6

৯৮. ***Pakistan Horizon*** , Vol XXIV, No-2, 1971, P. 117

৯৯. Tom Oliver, ***Ibid,*** P. 7

Dhaka University Institutional Repository

১০০. *Ibid*, P. 8

১০১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *পূর্বোক্ত*, ১২ খণ্ড, পৃঃ ১৫-২০।

১০২. ঐ, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৭৩৬-৭৩৭

১০৩. ঐ, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৭৪৮-৭৪৯

১০৪. ইত্তেফাক, ১৩ জুন, ১৯৭১

১০৫. জন, আর, কেলীর *ঐ সাক্ষাৎকার*

১০৬. জন, আর, কেলী জানিয়েছেন যে, পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে হুমকি আসলে সদরুদ্দিন তাকে তিনি তার পাশে দাঁড়াবেন। জন আর কেলীর *ঐ সাক্ষাৎকার*।

১০৭. *জয়বাংলা* (মুজিব নগর) ৩০ জুলাই, ১৯৭১ এবং মুক্তিযুদ্ধ (মুজিব নগর) ১০ আগষ্ট, ১৯৭১।

১০৮. *ইত্তেফাক*, ২৫ জুন, ১৯৭১

১০৯. ঐ

১১০. জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *পূর্বোক্ত*, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৭৪০-৪৫

১১১. জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *পূর্বোক্ত*, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৭৪০-৪৫

১১২. ঐ, পৃঃ ৭৪৯-৫০

১১৩. ঐ, পৃঃ ৭৪৮

১১৪. ঐ, পৃঃ ৭৫৫-৫৭

১১৫. ঐ, পৃঃ ৭৫৮-৬০

১১৬. ঐ, পৃঃ ৭৫৩-৫৪

১১৭. ***Basic facts About United Nations, Ibid,*** P. 75

১১৮. ***Bangladesh documents,*** P.P.160-63। আরো দেখুন ***Kessing,*** P. 29993

১১৯. ***Hindustan Times,*** 24 July, 1971

১২০. *জয়বাংলা* (মুজিবনগর), ৩০ জুলাই, ১৯৭১ (সম্পাদকীয়)। মুক্তিযুদ্ধ (প্রতিবেদন) ১ আগষ্ট, ১৯৭১

১২১. ***Pakistan Horzon,*** Vol XXII, No, 2 P. 117

১২২. Hasan Zahir, ***The Separation of East Pakistan : The Rise and Realization of Bengali Nationalism*** (Dhaka : UPL, 1997) P.P. 251-253

১২৩. ***New York Times,*** 20 May, 1971 এবং দুর্ভিক্ষের জন্যে দেখুন *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ মে, ১৯৭১।

১২৪. *দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ আগষ্ট, ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

১২৫. আগষ্ট মাসে জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রিলিফ টিম গঠনের কথা বলা হয়। দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ আগষ্ট, ১৯৭১।

১২৬. ঐ

১২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ আগষ্ট, ১৯৭১

১২৮. R.W. Timm, ***Ibid***, P. 186

১২৯. ***Ibid***, P. 187 । আরো দেখুন, *জয়বাংলা*, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

১৩০. R.W Timm, ***Ibid***, P. 190

১৩১. ***Mainichi Daily News***, (Japan) 22 October, 1971

১৩২. মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১* (ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৮৬) পৃঃ ৮৭।

১৩৩. ***New York Times***, 17 September, 1971

১৩৪. R.W. Timm, ***Ibid***, P. 188-84। আরো দেখুন Tom Oliver, ***Ibid***, P. 91

১৩৫. R.W. Timm , ***Ibid***, P. 189

১৩৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭১।

১৩৭. R.W. Timm, ***Ibid***, P.187

১৩৮. জাতিসংঘ দলিলপত্র, উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত* ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৭৭২-৭৫।

১৩৯. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মোট ৭টি কমিটি রয়েছে। এ সকল কমিটি সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় ও কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন করে। যেমন তৃতীয় কমিটি মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে।

১৪০. জাতিসংঘ দলিলপত্র, উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৭৮২-৮৭।

১৪১. ঐ, পৃঃ ৭৯৫-৭৯৬

১৪২. ঐ, পৃঃ ৭৯৫

১৪৩. ঐ, পৃঃ ৭৯৬-৭৯৭

১৪৪. ঐ, পৃঃ ৭৯৮

১৪৫. ঐ, পৃঃ ৮০০

১৪৬. ঐ, পৃঃ ৮০৫

১৪৭. ঐ, পৃঃ ৮০৬। আরো দেখুন *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১৪৯. *বাংলাদেশ নামে দেশ*, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ৬১।

১৫০. ***The Dawn*** , 2 September, 1971

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে বহুপাক্ষিক কূটনীতি ও জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া (জুন - নভেম্বর ১৯৭১)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, শরণার্থী সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক সংকটের পটভূমি সৃষ্টি করে এবং শরণার্থীদের বহুমুখী সমস্যায় জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সী প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। এসব কারণে জাতিসংঘ যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করে তাতে আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী ও উন্নত দেশসমূহ অংশগ্রহণ করে। এ উদ্যোগের প্রকৃতি ছিল মানবিক অর্থাৎ শরণার্থীদের তাৎক্ষণিক সমস্যা যেমন ভরণ পোষণের দিকটি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তবে এই রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ ও বিশ্ব রাজনীতিতে নিজস্ব কৌশল অনুযায়ী অগ্রসর হয়। ফলে উপমহাদেশের পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ সংকটকে বৃহৎ শক্তিগুলো স্বীয় জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত করার জন্যে প্রকাশ্য ও গোপন কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। একই সমান্তরালে জাতিসংঘ কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এই প্রতিক্রিয়ার দুটো দিক ছিল। এক. জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং দুই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সদস্য দেশসমূহের প্রতিক্রিয়া। বর্তমান অধ্যায়ে ১৯৭১-এর জুন মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সংকট প্রশ্নে বহুপাক্ষিক কূটনৈতি ও জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি অনুপূঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া ঃ পর্যবেক্ষক মোতায়েন প্রশ্নে বিতর্ক

প্রথমদিকে ভারত চেয়েছিল যে, পূর্ববাংলায় গণহত্যা বন্ধ ও সেখান থেকে আসা শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করুক।[১] অন্যদিকে প্রথমে পাকিস্তান শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘের জড়িত হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নিতে চায় নি এবং এ ধরণের যেকোন উদ্যোগকে পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল বলে বিবেচনা করে।[২] কিন্তু মধ্য মে মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘের যাবতীয় উদ্যোগ মেনে নিতে থাকেন। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম দেশসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে কূটনৈতিক তৎপরতায় সক্রিয় হয়ে উঠে-যাতে জাতিসংঘের চাপে ভারত বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রত্যাশা ছিল যে, শরণার্থীদের যে তালিকাটি তারা প্রস্তুত করেছে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তাদের প্রত্যাবর্তনও সম্ভব হবে।[৩] ভারত বিষয়টি অনুধাবন করে জাতিসংঘের মানবিক উদ্যোগের ছদ্মাবরনে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ মহাসচিবও এসময় যুক্তরাষ্ট্রের পরিপূরক ভূমিকা পালন করেন। গণহত্যা বন্ধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তিনি কার্যত নীরব থাকলেও জুলাই মাসের ১৯ তারিখ প্রথম প্রস্তাব করেন যে, শরণার্থী সমস্যা সমাধানে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী' বা 'পর্যবেক্ষক' মোতায়েন করা হোক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এর মানবিক বিবেচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, মুজিবনগর সরকার ও ভারতের প্রত্যাখ্যানের পর জাতিসংঘ কর্মকর্তারা শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি বাতিল করে দেয়। এই প্রস্তাবের রাজনৈতিক বিবেচনা বিশেষ করে আইনগত ও সামরিক গুরুত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত *জয়বাংলা*-পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে। *জয়বাংলা* -এর ভাষায়,

> পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড যখন চলছিল, তখন বাংলাদেশের নেতারা বার বার জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) ও বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে মানবতা ও বিশ্ব শান্তির জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছেন, এই শিশুঘাতি ও নারীঘাতি বর্বরতা বন্ধে সক্রিয় হোন, বাঙলাদেশে (বাংলাদেশে) মানবতার স্বার্থে জাতিসঙ্ঘের (জাতিসংঘ) হস্তক্ষেপ চাই। জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) কোটি মানুষের এই বিপন্ন আর্তনাদে কান দেয় নি। এই দীর্ঘ চার মাস পরে যখন ইয়াহিয়া চক্রের ধ্বংসযজ্ঞ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে, তখন জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় কি প্রয়োজন ? বাংলাদেশে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে এই নয়া চক্রান্তের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট । দখলীকৃত বাঙলাদেশে (বাংলাদশে) ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী এখন ক্রমবর্ধিত গেরিলা তৎপরতায় কাবু হয়ে পড়েছে। মুক্ত অঞ্চলে হানাদার বাহিনীর উপর এখন চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জাতিসংঘ সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনীর উপর এখন চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ (জাতিসংঘ) সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ইয়াহিয়ার হানাদার চক্রের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তাদের নেপথ্যের মুরব্বীরা চাচ্ছে হানাদারদের চরম মার থেকে বাচাঁতে। তাহলে মুক্তি বাহিনী ও গেরিলা তৎপরতা রোধ করা যাবে এবং তাদের মার থেকে হানাদার বাহিনীকে বাঁচানো যাবে, এই তাদের দুরাশা।[৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েন প্রস্তাবটি ছিল পাকিস্তান ও তার মিত্রদের প্রভাবিত প্রস্তাব। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মুখপাত্র *জয়বাংলা* -এর সম্পাদকীয় এ কথায় প্রমাণ করে। স্পষ্টতই পর্যবেক্ষক মোতায়েনের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য ছিল। (এক) বাংলাদেশের চারপাশ ঘিরে রেখে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাভিযান প্রতিরোধ করা, (দুই) মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ভারতীয় সহায়তার পথ বন্ধ করে দেয়া। পর্যবেক্ষক মোতায়েনের বিষয়টি আইনগত দিক থেকেও বৈধ ছিল না। বিশেষ করে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের তদারকি করার জন্যে সীমান্তের দুই অংশে পর্যবেক্ষক মোতায়েনের ক্ষমতা সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার অফিস (UNHCR) -এর এখতিয়ারভূক্ত নয়। কারণ জাতিসংঘ সনদের চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ কেবল এ ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৯৯ ধারা অনুযায়ী মহাসচিবের উদ্যোগ

পর্যবেক্ষক মোতায়েন প্রস্তাবের একদিন পর জাতিসংঘ মহাসচিব ৯৯ ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে একটি স্মারক পত্র প্রেরণ করেন।[৬] মহাসচিবের ঐ স্মারকপত্রে মোট ৮টি অনুচ্ছেদ থাকলেও বিভিন্ন বিবেচনায় তা অসম্পূর্ণ ছিল। প্রথমত, উপমহাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে চিত্রটি মহাসচিব তুলে ধরেছেন তা কিছুটা বিকৃত বটে। কারণ তিনি বাংলাদেশ সংকটকে ভারত ও পাকিস্তানের পূর্ববর্তী শত্রুতার জের হিসেবে দেখেছেন তিনি যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ পূর্ববর্তী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বনাম রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হয়েছিল তার উল্লেখ করে বাংলাদেশ প্রশ্নকেও তিনি আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন। এখানেও ভ্রান্তি রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের আন্দোলন পূর্ববর্তী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলোর চেয়ে ভিন্ন ছিল। তৃতীয়ত, ভারত ও পাকিস্তানকে বিবদমান পক্ষ হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ যে একটি পক্ষ ; তার কোন উল্লেখ নেই। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বাঙালিদের গণহত্যার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন নি।

মহাসচিবের এই স্মারকপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মূল ইস্যুগুলো এড়িয়ে গেছেন এবং তার এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে কিছুটা পরিমাণে সহায়তা করা। অবশ্য তার উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর চাপের মুখে তিনি প্রায়শই অসহায় ছিলেন। অভিযোগ আছে যে, তিনি তার পূর্বসূরী দ্যাগ হ্যামারশোল্ডের তুলনায় নিরপেক্ষ উদ্যোগ গ্রহণের মত ব্যক্তিত্বের অধিকারীও ছিলেন না।[৭] ফলে দেখা যায় যে, গোটা পরিস্থিতি বিবেচনার ভার তিনি নিরাপত্তা পরিষদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "Naturally it is for the members of the Security Council themselves to decide whether such consideration should be take place formally or informally, in public or private."[৮]

উথান্টের স্মারকপত্রে বর্ণিত সুপারিশ সমূহের কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সমর্থক ভারত বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায়। বিশেষ করে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের মূল পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয় এবং পাকিস্তানের পক্ষে যাবে এরকম জাতিসংঘের যে কোন হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতে থাকে।[৯] ২০ আগষ্ট প্রথম প্রকাশ পায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ববাংলা প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান না করার জন্যে মহাসচিবকে অনুরোধ করেছে।[১০] ফলে মহাসচিবের উদ্যোগ নেয়ার পরও নিরাপত্তা

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নি । এ পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিগুলো এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-থেকে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬ তম অধিবেশনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই অধিবেশনকে ঘিরে নেপথ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কূটনীতি অব্যাহত থাকে।

বহুপাক্ষিক কূটনীতি

১৯৭১-এ বাংলাদেশ প্রশ্নে অন্যতম পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল ১৯৭০ সালে নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের সাথে ক্ষমতাসীন ইয়াহিয়া সামরিক জান্তার মধ্যে একটি সমঝোতা। ২৮ মে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে লিখিত এক পত্রে জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে নিরবে কাজ করে চলছে।[১১] কিন্তু নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে ইয়াহিয়া খানকে শক্তিশালী অবস্থানে থাকতে সাহায্য করা। বিশেষ করে চীন মার্কিন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানের সন্তর্পণে দূতয়ালী এবং ভূ-রাজনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকারিভাবে পাকিস্তান ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করে।[১২] অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের সাহায্যদাতা কনসোটিয়াম পূর্ববাংলার অবস্থা ভয়াবহ রকম অস্থিতিশীল অভিহিত করে পাকিস্তানে এক বছরের জন্যে উন্নয়ন সাহায্য স্থগিত ঘোষণা করে।[১৩] যুক্তরাষ্ট্র কনসোর্টিয়ামের সিদ্ধান্তের সাথে প্রথমে দ্বিমত পোষণ করে এবং পরবর্তীতে প্রকাশ্যে কনসোর্টিয়ামের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। কিন্তু গোপনে পাকিস্তানকে আর্থিক ও অস্ত্র সাহায্য অব্যাহত রাখে।[১৪] ফলে পাকিস্তান এই বহুমাত্রিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নি। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাজনৈতিক এলিট ও পশ্চিম পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি এবং পত্রিকাসমূহের সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদান এবং বাঙালিদের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে ছাড় দেয়ার কোন ইচ্ছা তাদের নেই।[১৫] এমনকি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৮ জুন যে বেতার ভাষণ দেন সেখানে 'বিশেষজ্ঞ দ্বারা নতুন শাসনতন্ত্র' তৈরি করে বেসামরিক প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি থাকলেও আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার কোন ইঙ্গিত ছিল না। বরং পূর্ব বাংলায় নগ্ন ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু করা হয়।[১৬]

অবশ্য ভারত সরকারের নীতি নির্ধারকদের দক্ষিণপন্থী অংশসহ আরো অনেকেই প্রথমদিকে মনে করতেন যে, বহপাক্ষিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। তাদের ধারণা ছিল যে, ১৯৭১-এর মে পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হয় পতন ঘটবে নতুবা পশ্চিমা বিশ্বের আর্থিক সহায়তা বন্ধের কারণে তারা শেখ মুজিবের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হবে।[১৭] পশ্চিমা বিশ্বের আর্থিক সহায়তা বন্ধের বিষয়টি আংশিকভাবে সংঘটিত হলেও (বিশ্বব্যাংকের সাহায্য বন্ধ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য অব্যাহত) পাকিস্তানি জান্তা নতি স্বীকার করে নি। দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন কিসিঞ্জার জুটি ইয়াহিয়া

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক জান্তাকে বরাবরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এর পেছনে একটা বড় কারণ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পিংপং কূটনীতি। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে ভারতের আশাভঙ্গ হয় কিসিঞ্জারে চীন সফরের পর পরই। কারণ ঐ সফরের অব্যবহিত পর থেকে পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন হতে থাকে।

চীন সফর করে ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তনের দু-একদিন পরই কিসিঞ্জার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে তলব করে বলেন যে, উপমহাদেশে ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে চীন যদি পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে তবে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ১০ দিন আগের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসে।[১৮] কারণ কিসিঞ্জার নয়াদিল্লীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ১৯৬২ সালের মত এবারও যুক্তরাষ্ট্র চীনা আক্রমনের মুখে ভারতকে সহায়তা করবে। কিসিঞ্জারের সামনে তখন দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক. চীনের সঙ্গে বিনির্মিত নবতর সম্পর্ককে যুক্তরাষ্ট্র খুবই গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে এবং চীনের বন্ধুত্বের বিনিময়ে ভারতের গুরুত্ব গৌণ একথা বুঝালো। দুই. সাম্প্রতিক পিংপং কূটনীতির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে মূলধন করে ভারতকে নিবৃত্ত রাখা যাতে ইয়াহিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দসই রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়।

গোপন মার্কিন যোগাযোগ

বিভিন্ন লিখিত ও অলিখিত সূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উপদেষ্টা ও সুহৃদ হেনরী কিসিঞ্জার ১৯৭১-এ তাঁর পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক সমঝোতার জন্যে মুজিবনগর সরকারের দক্ষিণপন্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও তাঁর সমর্থকদের সাথে গোপন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই গোপন যোগাযোগ শুরু হয় জুনে এবং কিসিঞ্জারের ভাষ্য অনুসারে অক্টোবর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। উভয় পক্ষের মধ্যে মোট আটটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১৯] পাকিস্তানি সামরিক জান্তা প্রথমদিকে আওয়ামী লীগের সাথে কোন রকম সমঝোতায় রাজি ছিল না তাদের নির্ভরতা ছিল পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ ও ইসলামপন্থী দলগুলো এবং তাদের 'রাজাকার' 'আলবদর' ইত্যাদি সশস্ত্র বাহিনীর উপর। কিন্তু কিসিঞ্জারের পরামর্শে ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় রাজি হন। ৪ সেপ্টেম্বর ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ড ইয়াহিয়াকে বলেন যে, খন্দকার মোশতাক আহমেদের সাথে কোন বৈঠক তিনি সম্মত কিনা, যদি থাকেন তবে তা মোশতাককে জানিয়ে দেয়া হবে। প্রত্যুত্তরে ইয়াহিয়া তার সম্মতির কথা জানান।[২০] এই গোপন যোগাযোগের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে মার্কিন গবেষক লরেন্স লিফশুলৎস কার্নেগী এনডাউমেন্ট তদন্ত কমিশনের কাগজ পত্রের ভিত্তিতে লিখেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

> Therefore absolute discretion and secrecy was the key to splitting the Bengali leadership and supporting that faction which would compromise with Pakistan and not demand full independence. Some sources have suggested that the moment chosen was to be October, 1971, when Mustaque, as Foreign Minister, was expected to arrive in New York to present the Bangladesh case before the UN General Assembly. Had he suddenly in New York, unilaterally and without warning announced a compromise solution short of independence-a position that constituted a sell-out and betrayal in view of Tajuddin and the rest of the leadership-Mustaque might at that stage have pulled off a full coup against the rest of Awami leadership back in Calcutta, and the history of Bangladesh might have been very different.[২১]

অর্থাৎ মোশতাক তার আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় ইয়াহিয়ার সাথে একটি আপোষ ফর্মুলায় পৌঁছতে চেয়েছিলেন এবং তারা স্থান ও সময় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবন ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনকে। মোশতাক তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কূটকৌশলের আশ্রয় নেন এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের নতুন ফ্রন্ট খোলার লক্ষ্যে কাজ করেন। এজন্যে তিনি খুবই স্পর্শকাতর ও জনপ্রিয় ইস্যুকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্যে চেষ্টা চালান। এই আকাঙ্খা থেকেই আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে খন্দকার মোশতাক বিভিন্নভাবে বলতে শুরু করেন যে, "হয় স্বাধীনতা নয় শেখ মুজিবের মুক্তি। কিন্তু এ দুটোই এক সাথে অর্জন সম্ভব নয়।" প্রফেসর আমিনুজ্জামানের ভাষ্য অনুসারে বঙ্গবন্ধুর 'ছদ্ম প্রেমিকরা' এ সময় সোরগোল তুলল যে, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তানের মুরব্বী যুক্তরাষ্ট্রকে ধরতে হবে এবং ভারত ও সোভিয়েত বলয়ের সাথে অতিরিক্ত মাখামাখি বাদ দিতে হবে।[২২]

দেখা যাচ্ছে যে, এই সময় ইসলামাবাদে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১১ আগষ্ট সামরিক জান্তা ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অভিযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে। অবশ্য এ ঘোষণার একদিন পরে 'সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের' জন্যে তা পিছিয়ে দেয়া হয়।[২৩] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন শীর্ষস্থানীয় সংগঠক ও নির্মোহ বিশ্লেষক একদিনের জন্যে বিচার কার্য আরম্ভ করে অনির্দিষ্টকালের জন্যে পিছিয়ে দেবার ঘটনাকে রুশ ভারত মৈত্রী চুক্তির অব্যবহিত পরে ইয়াহিয়ার নমনীয়তা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৪] প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Chain Reaction) অনুযায়ী এই যুক্তি উপেক্ষনীয়

Dhaka University Institutional Repository

নয়। তবে ইয়াহিয়া এবং তার পৃষ্ঠপোষকদের অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। এটা হলো যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান প্রতীক পুরুষের বিচারের বিষয়টিকে 'জিম্মি' করে মুজিবনগর সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের নেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং তাজউদ্দিন বিরোধী বিভিন্ন উপদলগুলোর সমন্বয়ে ঐক্যজোট গঠন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুরোপুরি বিভক্ত করে ফেলা। ইতোপূর্বে লরেন্স লিফশুলৎসের ভাষ্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। অন্যান্য সূত্র থেকেও একই বিষয় বেরিয়ে আসছে।[২৫] প্রত্যক্ষদর্শী আনিসুজ্জামানের ভাষ্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, "একই সময় আওয়ামী লীগের মধ্যে আরেকটি বিষয়ে মতবিরোধ প্রবল হলো। বঙ্গবন্ধুর বিচারের যে ঘোষণা পাকিস্তান সরকার দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাজউদ্দিন বিরোধী আওয়ামীলীগের কোন কোন উপদল এক ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। তাদের মতে, বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট করছেন না। অথচ এটাই হওয়া উচিত আমাদের প্রথম লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার যে যথেষ্ট করছেন না তার কারণ হলো বঙ্গবন্ধু মুক্ত হলে কারো কারো নেতৃত্ব আর থাকবে না।"[২৬] কিন্তু ১৯৭১ সালে মোশতাক ও তার সমর্থকরা এই যে স্বাধীনতার বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুকে চেয়েছিলেন তা যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর কোন অনুরাগের বিষয় ছিল না চার বছর পর ১৯৭৫-এ বিয়োগান্তক আগষ্ট ট্র্যাজেডিতে প্রমাণিত হয়েছে। তদুপরি ১৯৭১-এর শুরুতে মোশতাক ভারতে পৌঁছে স্বাধীনতার জন্যে 'মরনপণ' সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে মক্কায় হজ্জব্রত পালনের পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তাজউদ্দিন আহমেদ তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পেতে চান জানতে পেরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।[২৭] অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রশ্নে মোশতাক আহমেদের বিঘোষিত আনুগত্য বরাবরই প্রশ্নবোধক ছিল।

এহেন মোশতাকের যুক্তরাষ্ট্র সফরের ব্যাগ্রতার 'কার্যকরণ' তাজউদ্দিন আহমেদের মত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতার অনুধাবন না করার কথা নয়। ফলে মোশতাক ও তাঁর সমর্থকদের 'স্বাধীনতা নয় বঙ্গবন্ধু' এই প্রচারনায় চনমনে তৎপর হওয়ায় তার আমেরিকা সফর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিগূঢ় সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাজউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মঈদুল হাসান (প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব) এই জটিল পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে লিখেছেন,

> আওয়ামী লীগের সকল স্তরে এই প্রশ্ন ছিল নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও ভাবাবেগের ইস্যু। কাজেই স্বাধীনতা না বঙ্গবন্ধুর প্রাণরক্ষা-এই সুচতুর প্রচারণার মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থনকে নতুন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুখে হাজির করে স্বায়ত্বশাসনভিত্তিক আপোষ ফর্মূলাকে শেখ মুজিবের মুক্তির সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যদি মার্কিন কর্তৃপক্ষ মোশতাককে আমেরিকা নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে থাকে, তবে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

বিস্মিত হবার যে কিছু ছিল না তা পাকিস্তানি সূত্র থেকেও নিশ্চিত হওয়া যায়। এই সময় নিয়াজীর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক নেতা দেখা করে তাকে উজ্জীবিত করতেন। এদের একজন মৌলানা মুফতি মাহমুদ তাকে জানান যে, ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা প্রয়োজন।[২৯] এ সময় পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনিবার্য পরাজয় রোধ করতে ইরানের শাহ-এর মধ্যস্থায় একটি গোপন প্রক্রিয়াও চলছিল।[৩০] যদিও রাজনৈতিক সমঝোতার নামে এই আপোষ ফলপ্রসু হয় নি, তবে একটি সুগভীর পরিকল্পনা অব্যাহত ছিল। যেমন ইয়াহিয়া ও খন্দকার মোশতাকের মধ্যে বৈঠকের উদ্যোগ নেয়া হয়।[৩১] এবং আগষ্ট মাসে ইয়াহিয়া অত্যন্ত আস্থার সাথে ঘোষণা করেন যে, ডিসেম্বরে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা হবে।[৩২]

কিসিঞ্জার এই সমঝোতা প্রয়াস সাফল্যের মুখ দেখেনি মূলত দুটো কারণে। এক. তাজউদ্দিন আহমেদের বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও সময়োচিত হস্তক্ষেপ। দুই, ইয়াহিয়া সামরিক জান্তার দোদুল্যমান মনোভাবের কারণে।

১৫ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ভারতের যুগ্ম-সচিব এ,কে, রায়কে জানান যে, যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কূটনৈতিক তাঁর সরকারের একাংশের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে অখণ্ড পাকিস্তানের অধীনে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছতে উৎসাহিত করেছেন এমন সংবাদ তার গোচরীভূত হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও এ,কে রায়কে জানান যে, দু'জন জাতীয় পরিষদ সদস্য কলকাতায় মার্কিন কনসুলেটর প্রতিনিধিদের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন।[৩৩] ফলে এ, কে, রায় পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীকে প্রেরিত এক নোটে জানতে চান যে, মুক্তাঞ্চলে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ত্রাণকর্মীদের নিরাপত্তার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করছেন বলে ভারত সরকার অবগত হয়েছেন এবং ভারত সরকার মনে করে যে, এ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিনিময় হলে ভারত ও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের যৌথ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বিত হতো। প্রত্যুত্তরে ২২ সেপ্টেম্বর মাহবুব আলম চাষী জানান যে, "কোন বিষয়েই মার্কিন প্রতিনিধির সাথে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কখনই যোগাযোগ হয়নি।" এই উত্তর পাঠাবার পূর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব বা অন্যকোন কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর সাথে কোন পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। শুধু তাই নয়, আশ্রয়দাতা সরকারের সাথে একটি নাজুক বিষয়ে নোট বিনিময় চলছে তার কোন সংবাদও প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া হয় নি।[৩৪] ফলে মোশতাক ও তার সমর্থকদের গতিবিধি ভারত সরকার সতর্কভাবে পর্যবেক্ষন করেন এবং শীঘ্রই জানা যায় যে, খন্দকার মোশতাক ও তার সহযোগিরা সংগোপনে মার্কিন প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলছেন। সবকিছু বিবেচনা করে তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার খন্দকার মোশতাক আহমেদের যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল করে। অনেকটা আকস্মিকভাবেই প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচিত হন লন্ডনে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

একই সময় বাংলাদেশ সরকার আওয়ামী লীগের সকল সদস্যকে বিদেশীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দলীয় শৃংঙ্খলা মেনে চলার পরামর্শ দেয়।[৩৫]

দ্বিতীয়ত, ইসলামাবাদে বরাবরই দুটো পক্ষ ছিল। একদল ছিল সমঝোতার পক্ষে এবং অন্যদল ছিল পূর্ব পাকিস্তানে নগ্ন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় তৎপর। ফলে দেখা যায় যে, ইয়াহিয়া সমঝোতার পথে কিছুদূর এগিয়ে আবার পিছিয়ে এসেছেন। বিশেষকরে ভুট্টো কখনই চান নি যে, বাংলাদেশ প্রশ্নে ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত কোন সমাধানে পৌঁছান। কারণ এতে ভবিষ্যতে ক্ষমতাগ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।[৩৪] বিশেষ করে কিসিঞ্জারের পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী খন্দকার মোশতাক আহমেদের নিউইয়র্ক উপস্থিত হতে না পারায় ইয়াহিয়া তখনকার মত আর রাজনৈতিক সমঝোতায় উৎসাহী হন নি। মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে তিনি অবৈধভাবে শূন্য ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৭৯টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু করেন। ১২ অক্টোবর তিনি খুবই সমর প্রবণ বক্তৃতা দেন এবং ঘোষণা করেন যে, "যুদ্ধ আসন্ন আমরা লড়াই করবো।"[৩৭]

দ্বৈত ভূমিকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন : মূল সমর্থন ভারতের প্রতি

মোশতাককে আমেরিকা নিয়ে যাবার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় কিসিঞ্জার দ্বিতীয় দফা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে তার লক্ষ্য ছিল পরাশক্তি পর্যায়ে উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমন। কিসিঞ্জারের এই উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি 'না' বলা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে আরেকটি বিবেচনা ছিল। এটা হলো পাকিস্তানের অন্তত প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করা ; কারণ ভবিষ্যতে কৌশলগত কারণে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান কাজে লাগাতে পারে। ফলে অন্তত প্রকাশ্যে কিছু ছাড় দেয়ার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশেষ করে অক্টোবরের প্রথম দশদিনে সোভিয়েত চাপের কারণে ভারত বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে অনেকটা নমনীয় হয়। ৪ অক্টোবর জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমরসেন বলেন যে, ইসলামাবাদের উচিত শেখ মুজিবের সাথে সমঝোতায় উপনীত হওয়া।[৩৮] ৮ অক্টোবর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরন সিং গোয়ায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভায় বলেন যে, পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনেও যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো কোন সমঝোতায় পৌঁছে তাতে ভারতের আপত্তি নেই।[৩৯] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমগ্র ভারত জুড়ে প্রবল সমর্থনের কারণে শরণ সিং এই আপোষ প্রস্তাবের কথা দলীয় ফোরামে উচ্চারণ করেন। এবং এটা করতে হয়েছে দুই পরাশক্তির চাপের মুখে।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চাপ দিয়েছিল অনেকটা সতর্কতামূলক এবং অনেকাংশে কূটনৈতিক দায় মুক্তির কারণে।[৪১] ফলে এই সময় আলজিয়ার্সে একজন শীর্ষ সোভিয়েত নেতার বক্তব্যে রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও জিইয়ে রাখে। প্রধানমন্ত্রী এন, কোসোগিন আলজিয়ার্সে প্রেসিডেন্ট বুমেদিনের সাথে যৌথ ইশতেহারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।[৪২]

দেখা যায় যে, বিভিন্ন কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে কিছুটা ছাড় দিলেও ভেতরে ভেতরে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে ভারতকে সহায়তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪৩] আগষ্ট মাসে রুশ ভারত মৈত্রী চুক্তির পর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা শুরু হয় মস্কোতে এবং এ সময় ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরের মাধ্যমে পরিস্থিতির মৌল রূপান্তর ঘটে। বিশেষ করে তিন শীর্ষ সোভিয়েত নেতা এল. আই. ব্রেজনেভ, এন. ডি. পদগর্ণি ও এ. এন. কেসোগিনের সাথে দুঘন্টা ব্যাপী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বহুবিধ বিষয় আলোচনা হয়। ঐ বৈঠকে দুই মিত্র রাষ্ট্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার কিছু গোপন রাখা হয় এবং অন্যান্য বিষয়াবলী আন্তর্জাতিক আইন, প্রচলিত রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে একটি যুক্ত ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। ঐ বৈঠকের পঞ্চম অংশগ্রহণকারী মস্কোতে এককালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দুর্গা প্রসাদ ধরের বিবরণী ও যুক্ত ইশতেহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উভয়পক্ষ দুটো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক. পরিস্থিতির অবনতি হলে ভারত ও সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখবে; দুই. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উপাদান বিদ্যমান।[৪৪] সোভিয়েত নিশ্চয়তা পেয়ে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তর সামরিক সংঘর্ষের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহায়তার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে এবং অন্যান্য ফোরামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করে। দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাতিসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে (২৬ তম) সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গেমিকো বলেন, "বাংলাদেশ সংকট পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়।"[৪৫]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে (২৬তম) বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

১৯৭১ এ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হওয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনকে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো কূটনৈতিক তৎপরতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। পাকিস্তান জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি নাজুক

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে পৃষ্ঠপোষক ও মিত্র দেশ সমূহের সহায়তায় সক্রিয় কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। অন্যদিকে নিজ অবস্থান থেকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্যে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারও প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে।

অধিবেশন সূচনার দুদিন আগে উথান্ট তার বার্ষিক রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, যদিও গৃহযুদ্ধের বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় তবে এই বিষয় থেকে যে সকল সমস্যার জন্ম হয়েছে তা আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই উদ্বেগের কারণ এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে খুবই কম অগ্রগতি হয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, " In a disaster of such vast proportaion the international community has clear obligation to help the governments and peoples concerned in every possible way. But as I have indicated the basic problem can be solved only by a political solution based in reconcilation and respect of humantarian principles is acheived."[৪৬] এ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক। তিনি সমস্যাটিকে মূলত ভারত পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছাতে উভয় দেশের উপর প্রভাব বিস্তারের কথা বলেন। তিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে সাধারণ পরিষদের বিতর্কের পক্ষে ছিলেন না। কারণ "There would be no end it"[৪৭] অর্থাৎ তাঁর ভাষ্য হলো যে, জাতিসংঘের জরুরি কর্তব্য হলো পাক-ভারত সমস্যার সমাধান, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ভাগ্য বা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নটি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আদম মালিকের বক্তব্য ও প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘের ২৬তম অধিবেশনে এজেন্ডাভূক্ত বিষয় হিসেবে 'বাংলাদেশ সংকট' সরাসরি স্থান পায় নি। তবে মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদনে ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে। মহাসচিবের 'বাংলাদেশ' শব্দটি উল্লেখ না করা এবং স্বয়ং সাধারণ পরিষদের সভাপতির উপেক্ষা করার প্রবণতা সত্ত্বেও ৫৭টি দেশের বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। তদুপরি জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সমবেত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিনিধিদের অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি এবং পূর্ববাংলা পরিস্থিতি প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়।[৪৮] এসব দেশের বক্তব্য একটি সারণিতে সাজানো যায় এবং এভাবে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা হবে। এগুলো হল :

ক. পূর্ববাংলা প্রশ্নকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে যেসব রাষ্ট্র ;

খ. শুধুমাত্র মানবিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যেসব রাষ্ট্র ;

গ. বিষয়টিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে যেসব রাষ্ট্র;

ঘ. শুধু গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বলছে যেসব রাষ্ট্র।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪.১

বাংলাদেশ সংকটে জাতিসংঘের (বার্ষিক অধিবেশনে) বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া

দেশ	সমস্যার উল্লেখ	সমস্যায় রাজনৈতিক ও মানবিক দিক উভয় সম্পর্কে উল্লেখ	শুধু মানবিক বিষয়ে নজর দেয়ার কথা	পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়	গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন
	১	২	৩	৪	৫
১. আফগানিস্তান	*	*			
২. আলবেনিয়া					
৩. আলজেরিয়া	*			*	
৪. আর্জেন্টিনা	*	*	*		
৫. অস্ট্রেলিয়া	*		*	*	
৬. অস্ট্রিয়া	*	*			
৭. বাহরাইন					
৮. বার্বাডোজ					
৯. বেলজিয়াম	*	*			
১০. ভুটান					
১১. বলিভিয়া					
১২. বৎসোয়ানা					
১৩. ব্রাজিল					
১৪. বুলগেরিয়া					
১৫. বার্মা					
১৬. বুরুণ্ডি					
১৭. বাইলোরুশ					
১৮. ক্যামেরুন					
১৯. কানাডা					
২০. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র					
২১. শ্রীলংকা (শ্যালন)	*	*			
২২. শাদ					
২৩. চিলি	*		*		
২৪. চীন (তাইওয়ান)	*		*		
২৫. কলাম্বিয়া					
২৬.কঙ্গো					
২৭. কোস্টারিকা					
২৮. কিউবা					
২৯. সাইপ্রাস	*	*			
৩০. চেকোশ্লোভিয়া					
৩১. ডেহেমি (Dahomey)					
৩২. ডেনমার্ক					
৩৩. ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র					
৩৪. ইকুয়েডর	*	*			*
৩৫. মিশর	*		*	*	
৩৬. এল সালভাদর					
৩৭. মধ্য গায়ানা					
৩৮. ইথোপিয়া	*	*			

Dhaka University Institutional Repository

দেশ	১	২	৩	৪	৫
৩৯. ফিজি					
৪০. ফিনল্যান্ড	*	*			
৪১. ফ্রান্স	*	*			
৪২. গ্যাবন					
৪৩. গাম্বিয়া					
৪৪. ঘানা	*		*		
৪৫. গ্রীস					
৪৬. গুয়েতেমালা			*		
৪৭. গায়ানা					
৪৮. গুইয়ানা (Guyana)	*	*			
৪৯. হাইতি					
৫০. হন্ডুরাস					
৫১. হাঙ্গেরী					
৫২. আইসল্যান্ড	*	*			
৫৩. ভারত	*	*			
৫৪. ইন্দোনেশিয়া	*	*		*	
৫৫. ইরান	*	*		*	
৫৬. ইরাক					
৫৭. আয়ারল্যান্ড	*	*		*	
৫৮. ইসরাইল	*	*			
৫৯. ইতালি	*	*			
৬০. আইভেরী কোষ্ট					
৬১. জ্যামাইকা	*		*	*	
৬২. জাপান	*		*		
৬৩. জর্দান					
৬৪. কেনিয়া					
৬৫. খেমার প্রজাতন্ত্র (কম্বোডিয়া)					
৬৬. কুয়েত					
৬৭. লাওস	*		*		
৬৮. লেবানন	*	*			
৬৯. লসোথো					
৭০. লাইবেরিয়া	*		*		
৭১. লুক্সেমবার্গ	*		*		
৭২. মাদাগাস্কার	*		*		*
৭৩. মালাউই					
৭৪. মালেশিয়া					
৭৫. মালদ্বীপ					
৭৬. মালি					
৭৭. মাল্টা	*	*			*
৭৮. মৌরিতানিয়া					
৭৯. মরিশাস					
৮০. মেক্সিকো	*		*		
৮১. মঙ্গোলিয়া	*	*			
৮২. মরক্কো					
৮৩. নেপাল	*	*			
৮৪. নেদারল্যান্ড	*		*		

Dhaka University Institutional Repository

দেশ	১	২	৩	৪	৫
৮৫. নিউজিল্যান্ড	*	*			*
৮৬. নিকারাগুয়া	*		*		
৮৭. নাইজার					
৮৮. নরওয়ে	*	*			
৮৯. ওমান					
৯০. পাকিস্তান	*	*		*	
৯১. পানামা					
৯২. প্যারাগুয়ে					
৯৩. গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো					
৯৪. পেরু					
৯৫. ফিলিপাইন					
৯৬. পোল্যাণ্ড	*	*			
৯৭. পর্তুগাল					
৯৮. কাতার					
৯৯. রোমানিয়া					
১০০. রোয়ান্ডা					
১০১. সৌদি আরব	*	*		*	
১০২. সেনেগাল					
১০৩. সিয়েরালিওন	*	*			
১০৪. সিঙ্গাপুর					
১০৫. সোমালিয়া					
১০৬. দক্ষিণ আফ্রিকা					
১০৭. স্পেন					
১০৮. সুদান					
১০৯. সোয়াজিল্যান্ড					
১১০. সুইডেন	*	*			*
১১১. সিরিয়া	*		*	*	
১১২. থাইল্যান্ড	*		*		
১১৩. টগো					
১১৪. ত্রিনিদাদ এবং টবেগো					
১১৫. ভিক্তনোশিয়া					
১১৬. তুরস্ক	*		*	*	
১১৭. উগান্ডা	*	*			
১১৮. ইউক্রেন					
১১৯. সোভিয়েত ইউনিয়ন	*	*			
১২০. সংযুক্ত আরব আমিরাত					
১২১. ব্রিটেন	*	*		*	
১২২. তাঞ্জানিয়া	*		*		
১২৩. যুক্তরাষ্ট্র	*	*		*	
১২৪. আপার ভোল্টা					
১২৫. উরুগুয়ে	*		*		
১২৬. ভেনুজুয়েলা					
১২৭. ইয়েমেন	*		*		
১২৮. ইয়েমেন (সানা)	*		*	*	
১২৯. যুগোশ্লোভিয়া	*	*			
১৩০. জাম্বিয়া	*		*		

সূত্র জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনের দলিলপত্র বিশ্লেষণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৪.১ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাতিসংঘের অনেক সদস্য দেশ 'বাংলাদেশ সমস্যা' উল্লেখ করে নি। ভারত এবং পাকিস্তানসহ মাত্র ৫৭টি দেশ তাদের বিবৃতিতে এ সংকটের উল্লেখ করে। এ ৫৭টি দেশের মধ্যে ২২টি দেশ মানবিক বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ৩৩টি দেশ মানবিক বিষয়ের সাথে সমস্যাটির রাজনৈতিক দিকটি চিহ্নিত করে। কিছু রাষ্ট্র বিষয়টিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্য কয়েকটি দেশ রাজনৈতিক সমাধানের ওপর বেশী গুরুত্বারোপ করে। কিছু দেশ সমস্যাটিকে ভারত পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে সমাধান করতে আহ্বান জানায় এবং তাদের বক্তব্য হলো, যদি তা না করা হয় তবে ভারত পাকিস্তানের শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে।

সাধারণ পরিষদে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধি নিজ নিজ সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন। যেমন, ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং বাংলাদেশের অবস্থার বিবরণ দিয়ে করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসক গোষ্ঠী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।[৪৯] তার বক্তৃতায় বাঁধা দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্টদূত আগাশাহী বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। আগাশাহী বলেন, জাতিসংঘে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না।[৫০] এ সময়ে সৌদি আরবের রাষ্টদূত জামিল বারুদি বলেন তিনি এ বৈধতার প্রশ্নে মনে করেন যে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার বক্তৃতায় বাধা দেয়া যায় না। তবে তার বক্তৃতার যে অংশে পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ আছে, সে অংশ বাদ দিলে কোন আপত্তি থাকবে না। তিনি বলেন যে, ভারতে শরণ সিং শরণার্থীদের কথা বলতে পারবেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কে আলেচনা বাদ দিলে ভাল হয়।[৫১] এই পরিস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের সভাপতি আদম মালিক রাষ্ট্রদূত জামিল বারুদির বক্তব্য শরণ সিং গ্রহণ করবেন কিনা জানতে চান। এর উত্তরে শরণ সিং বলেন, "আমি আমার বক্তব্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিখেছি। পাকিস্তানে নির্যাতন ও নীপিড়ণের ফলে যখন অন্য রাষ্ট্রকে অসুবিধায় পড়তে হয়, তখন কিছুতেই বলা চলে না যে, সেটা অভ্যন্তরীণ বিষয়। পাকিস্তানের সীমাহীন নিপীড়ণ ও নির্যাতনের ফলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এবং এর সমাধান করার দায়িত্বও জাতিসংঘকে নিতে হবে। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডে সৃষ্ট শরণার্থী সমস্যার কারণে বিশ্বের বহু রাষ্ট্রকে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হচ্ছে। শরন সিং আরো বলেন, "পূর্ব বাংলা সমস্যার সমাধান করতে হলে শেখ মুজিবকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এবং সেটা শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রতিনিধির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।"[৫২]

শরণ সিং এর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতা মাহমুদ আলী বলেন, "পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং অস্তিত্বের ব্যাপারে কাউকে প্রশ্ন করতে না দিতে আমরা বদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

পরিকর।"[৫৩] কিন্তু মাহমুদ আলী না চাইলেও পূর্ববাংলার বিয়োগান্ত ঘটনাবলী, মানবিক বিপর্যয় এবং সংকটের রাজনৈতিক প্রকৃতি নিয়ে অন্তহীন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। জাতিসংঘের বাইরে বেসরকারি আন্তর্জাতিক ফোরামেও ধ্বনিত হয়েছিল প্রতিবাদ। যেমন, মিশরের আল আহরাম পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক ডঃ কেলাভিস মকসুদ (জয়প্রকাশ নারায়নের উদ্যোগে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত) বাংলাদেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলেন, "কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমেই পূর্ববাংলা সমস্যার নায্য সমাধন সম্ভব।" তার মতে, "ভারত পাকিস্তান বিরোধের পরিবর্তে এটি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ও জনগণের মধ্যে একটি বিরোধ।"[৫৪] ১৫ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের এম, পি, জন স্টোন হাউজ ঘোষণা করেন যে, "Bangladesh is no more an internal issue."[৫৫] ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের প্রভাবশালী দৈনিক ***Guradian*** -এ প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হলো, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অর্থ সাহায্য করা উচিত হবে কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে।[৫৬]

মহাসচিবের **Good Office** প্রস্তাব

মুক্তিসেনাদের অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের পরিস্থিতি যখন একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল তখন উথান্ট আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০ অক্টোবর তিনি ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে একটি পত্রে তাঁর Good Office ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। ঐ পত্রে মহাসচিব বলেন,

> In this potentially very dangerous situation I feel that it is my duty as Secretary-General to do all that I can to assist the governments immediatally concerned in avioding any development which might lead to disaster. I wish your Excellency to know, therefore, that my good offices are entirely at your disposal if you believe that they could be helpful at any time.[৫৭]

মহাসচিবের এই পত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো যে, তিনি সমগ্র বিষয়টিকে বিবেচনা করেন ভারত-পাকিস্তান সংঘাত হিসেবে। কিন্তু বিষয়টি তা ছিল না এবং বর্তমান গবেষণায় এটি অনেকবার আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানও সমস্যাটিকে পাক-ভারত সংঘর্ষ হিসেবে পরিণত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কারণ এতে মূল সমস্যা অর্থাৎ বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রাম অমীমাংসিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ইয়াহিয়া ও জাতিসংঘ মহাসচিব দুজনই সমস্যাটিকে দেখেছেন পাক-ভারত সমস্যা হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

তদুপরি মহাসচিবের মধ্যস্থতা প্রস্তাব ছিল বিপর্যস্ত ইয়াহিয়ার জন্যে আশীবাদ স্বরূপ। তাই একদিন পরেই এ প্রস্তাবে পাকিস্তানের কথা সম্মতির জানিয়ে ইয়াহিয়া লিখেন, "I welcome the offer have made for making your good offices available and very much hope that you can pay an immediate visit to India and Pakistan to discuss the ways and means of withdrawal of forces. This, I am sure, will have a salutary and desarble effect and further the cause of peace."[৫৮]

অবশ্য ভারত মহাসচিবের Good Office প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখান করে নি। কারণ সরাসরি প্রত্যাখান করা সম্ভব ছিলনা। যেহেতু পত্রটি ছিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রশাসকের যার সাথে মর্যদার প্রশ্নটি জড়িত ছিল। সেজন্য কিছুটা সময় নিয়ে মহাসচিবের প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। ইন্দিরা গান্ধী যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী সফরে ছিলেন ; ফলে বিলম্বের অজুহাতও জুটে গেল। প্রায় মাসখানেক পরে বিদেশ থেকে ফেরে ইন্দিরা গান্ধী ১৬ নভেম্বর প্রত্যুত্তরে মহাসচিবকে জানান, "The consequence of the activities of the military regime of Pakistan threaten and distort the entire fabric of our national life and it pose a serious threat to our security." ইন্দিরা গান্ধী আরো বলেন যে, পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে ভারত -পাকিস্তান সমস্যায় পরিণত করতে চায়। দ্বিতীয়ত, শরণার্থীদের অব্যাহত দেশ ত্যাগের মূল কারণকে অবজ্ঞা করা যায় না। ইন্দিরা গান্ধী তার বার্তায় মহাসচিবকে কৌশলে জানিয়ে দেন যে, ভারত-পাকিস্তানের পরিবর্তে তার উচিত ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, " It is always a pleasure to meet you and exchange views. Whatever efforts you can make to bring about a political settlement in East Bengal which meets the declared wishes of the people there, will be welcome, and if you are prepared to view the problem in perspective you will have our support in your initiatives."[৫৯]

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় মহাসচিবের বিরুদ্ধে একটি প্রচ্ছন্ন অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছিল। আর সেটা হলো মূল সমস্যা পাশ কাটিয়ে তিনি কৌশলে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন। ফলে দেখা যায়, মহাসচিব বিব্রত বোধ করেন এবং অভিযোগ অস্বীকার করেন। ২২ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত বার্তায় তিনি জানান, "The exercise of good office requires the assent and cooperation of all the parties concerned. Under the present circumastances,

Dhaka University Institutional Repository

much to my regret, there does not seem to be a, basis for the exersize of the Secretary Generals good offices in this unfortunetely serious and complicated problem."[৬০] উপমহাদেশে ভূমিকা পালনের জন্যে জাতিসংঘের আরেকটি উদ্যোগের এভাবেই সমাপ্তি ঘটে।

দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭১-এর মধ্যভাগ থেকে মহাসচিব দুটো উদ্যোগ নেন। এক. সীমান্তের দু'অংশে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) পর্যবেক্ষক মোতায়েন। দুই. নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি বরাবরে পত্র প্রেরণ। আপাত দৃষ্টিতে তা সাধু উদ্যোগ মনে হলেও বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, মহাসচিবের এই উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির পরিপূরক ছিল। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম দেশগুলো সে সময় এমনি উদ্যোগ আশা করতো। এই সম্মিলিত কোরাসের একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। এটি হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যারা সমস্যা সম্পর্কে যথাযথ অবহিত নয় তাদেরকে বিভ্রান্ত করা। বর্তমান অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে শতাধিক রাষ্ট্র অংশ নেয়, তার মধ্যে মাত্র ৫৭টি রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। এর মধ্যে অনেকেই মানবিক বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, তবে সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ মহাসচিব ও তার পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি বহুপাক্ষিক কূটনীতি চলে যার নেপথ্যে মূল কুশীলব ছিলেন হেনরী কিসিঞ্জার। তিনি পরাশক্তি পর্যায়ে যেমন কূটনৈতিক চাল দেন, তেমনি মুজিবনগর সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের নেতা খন্দকার মোশতাকের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতর একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়া। এ জন্যে খন্দকার মোশতাকের নিউইয়র্কে উপস্থিতিকে চূড়ান্ত ক্ষণ হিসেবে বেছে নেয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরেই তাজউদ্দিন আহমেদ মোশতাকের নিউইয়র্ক সফর বাতিল করে দিয়ে ইতিহাসের গতিপথ সঠিক দিকেই পরিচালিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Robert Jacson, ***South Asian Crisis*** (Delhi : Vikas Publishing House, 1987) PP. 60-61

২. Hasan Zahir, ***The Separation of East Pakistan : The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*** (Dhaka : UPL, 1994) P.251-253

৩. Robert Jacson, ***Ibid***, P. 66

৪. ***Ibid,*** P. 61

৫. *জয়বাংলা,* (মুক্তাঞ্চল) ৩০ জুলাই, ১৯৭১

৬. UN Doc, A/8401, Para 4

৭. উথান্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি তার পূর্বসূরীদের তুলনায় বেশ নিষ্ক্রিয় মহাসচিব। তিনি একদশক মহাসচিব ছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে সনদের ৯৯ ধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তার পূর্ববর্তী মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (Dag Hammarshold) অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে সুয়েজ সংকট, কঙ্গো সংকট ইত্যাদি প্রশ্নে সক্রিয়, তড়িত ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভূমিকা মহাসচিবের পদকে নতুন মাত্রা এনে দেয়। অন্যদিকে উথান্ড বরাবরই অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবের ভূমিকা পালন করেন। ***The Year Book of World Affiars, 1972*** (London : Stevens & Sons, 1972) PP. 43-79

৮. ***Bangla Desh Documents,*** (Delhi : Ministry of External Affiars, Government of India, 1971) PP. 58-59

৯. Robert Jacson, ***Ibid,*** P. 73

১০. ***The Statesman,*** 20 August, 1971

১১. Henry Kissinger, ***The White House Years***, (Delhi : Vikas Publishing, 1979) PP. 857-58

১২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (ঢাকা ঃ ভানা প্রকাশনী, ১৯৮১ পৃঃ ৪৬-৫৬

১৩. ***Washington Post,*** June 30, 1971

১৪. ***Times of India,*** 15 July, 1971 এবং মার্কিন অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে দেখুন ***Bangladesh*** (Mujibnagar) 25 August, 1971

১৫. বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জুলফিকার আলী ভুট্টো ও মুসলিম লীগ প্রধান কাইয়ুম খান। দেখুন ***The Observer*** (Dhaka) 23 June, 1971। বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি ও সম্পাদকীয়-এর জন্যে দেখুন *পূর্বদেশ* ২৩, ও ২৪ জুন ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইয়াহিয়ার 'শাসনতন্ত্রে' যেসব সুপারিশ করা হয় তাতে দেখা যায় যে, আরবী হরফে বাংলা লেখা, পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদেশের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। দেখুন ***The Times*** (UK) 12 July, 1971

১৭. G.S Bhargara, ***Suceess or Serrender :The Simla Summit*** (Delhi, Steering Publishers, 1972) PP. 110-111

১৮. Lt. Gen J.F.R. Jacob, ***Sarreder at Dacca : Birth of a Nation*** (Dhaka : UPL, 1997) P. 95

১৯. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে কিসিঞ্জার নিজেই স্বীকার করেন, "We established contract with the Bangladesh people in Calcutta, and during August, September and October of this year, no fewer than eight such contract took place. We are approached President Yahiya Khan three times in order to begin negotiations with Bangladesh people in Culcutta. The government of Pakistan accepted." See ***Congressional Record December 9, 1971,*** P.45735 আরো দেখুন, লেলোয়ার হোসেন, *মুজিব হত্যার সি, আই, এ,* (ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশনস, ১৯৯৬) পৃঃ ২৯-৩২ বিভিন্ন সাক্ষাৎকারেও একই বিষয় ওঠে এসেছে। যেমন রেহমান সোবহান, এ. এম. এ. মুহিত, এ. এইচ. মাহমুদ আলী , এম. আর. আখতার মুকুল প্রমুখ বলেছেন যে, মোশতাকের সাথে মার্কিন কর্মকর্তাদের যোগাযোগ হয়েছিল।

২০. Henry Kissinger, ***Ibid,*** P.870

২১. Lawrence Liftschultz, ***Bangladesh :The Unifinished Revolution*** (London : Zed Press, 1979) P. 166

২২. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর* (ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৭১) পৃৎ ১৫৩

২৩. ***The Sundy Telegraph,*** August 15, 1971

২৪. মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১* (ঢাকা : ইউ পি এল, ১৯৮৬) পৃঃ ৭৪

২৫. লেলোয়ার হোসেন, *মুজিব হত্যার সি আই এ* (ঢাকা :এশিয়া পাবলিকেশনস, ১৯৯৬) পৃঃ ২৯-৩৫, আব্দুস সামাদ আজাদ, একান্ত সাক্ষাৎকার, ১৯৯৮

২৬. আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ১৫৩।

২৭. মঈদুল হাসান, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ৮৯

২৮. ঐ, পৃঃ ৯০.

২৯. A.A.K Niazi, ***The Betryal of East Pakistan*** (Karachi : Oxford University Press, 1998) P. 94.

Dhaka University Institutional Repository

৩০. এম আর আখতার মুকুল একান্ত সাক্ষাৎকার, ঢাকা ১৯৯৮। এছাড়া মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত *জয়বাংলা* সেপ্টেম্বরের ৪র্থ সপ্তাহের শুরুতে লিখে যে, ভারতের সঙ্গে ইরানের দ্রুদতামূলক সম্পর্কের সুযোগে তারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ইরানকে অবতীর্ণ করতে চায়। *জয়বাংলা*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৩১. Sardar Mohmood, ***Pakistan Divided*** (Delhi: Alpha Bravo, 1983) P.170 এবং President Nixon's Foreign Policy Report to Congress 9, February, 1972 । একই সময় মৌলনা ভাসানীও এক বিবৃতিতে বলেন যে, "সীমান্তের জন্যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, দেশবাসীরা সাবধান" দেখুন *স্বাধীন বাংলা* (মুক্তাঞ্চল) ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১ নভেম্বর ১৯৭১।

৩২. ***The Dawn,*** 30 August ১৯৭১.

৩৩. মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১* (২য় সংস্করণ, ঢাকা :ইউপিএল, ১৯৯২) পৃঃ ৮-৮

৩৪. ঐ

৩৫. Richard Sission & Leo Rose, ***War and Secession : Pakistan, India and Creation of Bangldesh,*** (Delhi :Vistaar Pub, 1990) P.174

৩৬. G.W. Chowdhury : ***The Last Days of United Pakistan*** (Bloomington :Indiana University Press, 1974) P. 196, ভুট্টোর ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন A.A.K Niazi, ***Ibid*** P. 93.

৩৭. ***The Dawn,*** 13 October, 1971

৩৮. Robert Jacson, ***Ibid,*** P. 86

৩৯. "He (Sarwan) said any solution agreeable to the elected representatives of Bangla Desh be it independence, greater autonomy to the Eastern Region or agreement to the elected representatives of Bangla Desh." ***The Times*** (Goa) October 9, 1971

৪০. মার্কিন চাপ ছিল প্রবল। বিশেষ করে কিসিঞ্জার খুবই তৎপর ছিলেন। দেখুন ***Wasington Post*** (USA), 11 January 19726। সোভিয়েত চাপের জন্য দেখুন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা," সালাউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস,* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃঃ ৩৯১

৪১. সর্তকতামূলক এ কারণে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চিত হতে চেয়েছিল বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার প্রশ্নে কতটা অটল। কারণ ইতোমধ্যেই একটা অংশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য তাজউদ্দীন অক্টোবরের শুরুতে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "যারা মানব স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী তারা আমাদের সংগ্রামকে সমর্থন করতে বাধ্য। তবু সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে বা বিশ্ব স্ট্যাটেজির স্বার্থে যারা আমাদের সাহায্য ও সমর্থন দিতে অপারগ তাদের উচিত নীরব থাকা।" *জয়বাংলা* (মুজিবনগর), ৮ অক্টোবর ১৯৭১। কূটনৈতিক দায়মুক্তির জন্যে দেখুন, Robert Jacson, ***Ibid,*** P. 86

৪২. ***Times of India,*** 10 October, 1971 এবং ***The Dawn,*** 10 Oct, 1971

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. সোভিয়েত নীতির প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে Robert Jacson লিখেছেন "The Russians may have been telling the Indian Governement in private that it was necessary for the Soviet Union to make at least of show of action in the Subcontinent in order to impress the Americans." Robert Jacson, ***Ibid,*** P. 86.

৪৪. যুক্ত ইশতেহারের পূর্ণ বিবরণের জন্যে দেখুন, ***Soviet Rivew***, Supplimenmt Issue-3 Vol IX, January 18, 1972. দূর্গা প্রসাদের বিবরণ সম্পূর্নভাবে বর্ণিত হয়েছে মঈদুল হাসানের গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, "Both sides then had a discussion to asses the stamina of the liberation struggle, its capacity to sustain itself inside Bangladesh, Commitment of Awami League leadership for indepence and the extent of its break with West Pakistan. Brezhnev observed that, 'there is an element of national liberation in the present situation." দেখুন মঈদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১০২

৪৫. Rafiqul Islam, ***Bangladesh Liberation Movement : International Legal Implication*** (Dhaka :UPL, 1987) P. 126.

৪৬. UN Doc, A/84011, Para 191

৪৭. পূর্ববাংলা প্রশ্নে আদম মালিক বলেন, "We must presuade Pakistan and India to get togather and see how they can limit the pilitical problem see, Times of India, 23 September 1971, ***Hindustan Times,*** 24 September, 1971

৪৮. এ, এইচ মাহমুদ আলীর সাক্ষাৎকার ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮। চীনের অন্তর্ভূক্তির আরো তথ্যের জন্যে দেখুন UN Doc, A/8401

৪৯. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (ঢাকা : ইউপিএল, এন ১৯) পৃঃ ১৭৬।

৫০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৫১ আবু সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭৭

৫২. Robert Jacson, ***Ibid,*** P.82 আরো দেখুন আবু সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭৭

৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৫৪. ***Times of India,*** 25 September, 1971

৫৫. ***Bangladesh Today*** (London) Vol, 1, No-2, 15 Sept, 1971

৫৬. ***The Gurdian,*** 27 September, 1971

৫৭. UN Doc, S/10410, Para-6

৫৮. UN Doc, S/10410, Para-7

৫৯. ***Kessing Contyemporary Archives,*** (UK : Kessing Pub. 1972) P. 24992.

৬০. UN Doc, S/10410, Para-10

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মুজিবনগর* সরকার ও জাতিসংঘ

পাকিস্তানি শাসকদের জাতিগত নিপীড়ন ও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। ২৫ মার্চের গণহত্যা, পূর্ববাংলায় সামরিক শাসন জারি, পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার ইত্যাদি কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোতে অনিবার্য ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। এ নতুন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও অনান্য দলের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ মুক্তাঞ্চল ও ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেন। ১০ এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার এবং ১৭ এপ্রিল শনিবার কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমান জেলা) বৈদ্যনাথ তলা গ্রামে মুজিবনগর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি বৈধ কতৃপক্ষ সৃষ্টি হয়।[১] একটি কার্যকরী সরকার হিসেবে মুজিবনগর সরকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম (মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও মুক্তাঞ্চল প্রশাসন চালু) এবং বৈদেশিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার বহুমুখী তৎপরতা চালায় এবং মানবজাতির সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক ফোরাম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধের প্রধান নেতা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ, রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, "বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন, সার্বভৌম ও শান্তিকামী একটি দেশ হিসেবে রাষ্ট্র পরিবার গোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান পাওয়া আমাদের জন্মগত অধিকার।"[২]

তাজউদ্দিন আহমেদ 'রাষ্ট্র পরিবার গোষ্ঠী' বলতে কি বুঝিয়েছিলেন? আন্তর্জাতিক আইনের পরিভাষায় 'রাষ্ট্রপরিবার গোষ্ঠী' বলতে বুঝায় আন্তর্জাতিক সমাজ যার মূর্তিমান ফোরাম হল জাতিসংঘ অর্থাৎ তাজউদ্দিন আহমেদ প্রকারান্তরে জাতি সংঘ কর্তৃক বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের দাবি উথাপন করেছিলেন। বাংলার বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা মাওলানা

---

* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হচ্ছে। একদল এই সরকারকে বলে থাকেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। প্রধানত বিদেশী গবেষকেরা এই শিরোনামটি ব্যবহার করে থাকেন। আবার অনেককে এই সরকারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হিসেবেও অভিহিত করেন। কেউ আবার বলেন অস্থায়ী সরকার। এসব নামকরণ যে ভুল তা বলা যায় না। কারণ প্রত্যেকটি নামকরণের পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। তবে এই সরকার পরিচিত হয়ে ওঠে মুজিবনগর সরকার হিসেবে। আদর্শগত দিক বিবেচনা করলে এই নামকরণ ও পরিচিতির ব্যাপারটি ১৯৭১ এর প্রেক্ষাপটে সঠিকই ছিল। কারণ বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর স্বীকৃতির প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ন ছিল। বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ কার্যত স্বীকৃতি (Defacto) দিলেও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয় লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সমর্থক ভারত ৬ ডিসেম্বর প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। এমতাবস্থায় এই সরকার তার রাজধানী নামে পরিচিত হবে তা খুবই স্বাভাবিক। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসে প্রথম এই সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর মহাকুমার বৈদ্যনাথ তলা গ্রামে মুক্তভূমিতে এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এই বৈদ্যনাথ তলার নতুন নাম দেয়া হয় মুজিবনগর। কিন্তু তারপরও সে সরকারকে নিরাপত্তার কারণে বাস করতে হয় কলিকাতার থিয়েটার রোডের এক বাড়িতে। তখন সেটাকেই ধরা হত মুজিবনগর হিসেবে; তা সে মুক্তাঞ্চলই হোক বা ভারতের যেকোন জায়গায় হোক। বাংলাদেশ সরকার নিজেকে কখনই প্রবাসী হিসেবে স্বীকার করেনি। দরকারও হয়নি। কারণ বাংলাদেশের কোন না কোন অংশ সবসময়ই মুক্ত ও বাংলাদেশ সরকারের অধীনে ছিল। বর্তমান গবেষণায় তাই ১৯৭১-মার্চ-ডিসেম্বর কালপর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে মুজিবনগর সরকার হিসেবেই বর্ণনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভসানীও এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ মহাসচিবের Good Office ব্যবহারের আবেদন জানান।[৩]

১৯৭১ সালের মার্চ পরবর্তী মাসগুলোতে বাঙালিরা নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনের সামনে গণহত্যা বন্ধ, শরণার্থী সমস্যা সমাধান এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও জাতিসংঘের সদস্যদের পদ প্রদানের জন্য বিক্ষোভ করে। আমেরিকা প্রবাসী বাঙালিরা এ সময় জাতিসংঘ মহাসচিব ও জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেন।[৪] আগষ্ট মাসে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদলের সাথে জাতিসংঘের সরাসরি পত্র যোগাযোগ হয়, সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধিদল জাতিসংঘ ভবনে বাংলাদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের পক্ষে জোরালো প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। ৪ ডিসেম্বর প্রতিনিধি দলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট একটি পত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বাস্তবতা তুলে ধরেন। দেখা যায়, মুজিবনগর সরকারের সাথে জাতিসংঘের সরাসরি কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে সম্পর্কের একটি ছিদ্রপথ প্রথম থেকেই উন্মুক্ত ছিল এবং পরে তা আরো প্রশস্তও হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭১ -এ দক্ষিণ এশিয়ার জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল মুজিবনগরের অসহায় মানুষ। ফলে জাতিসংঘ ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে সরাসরি কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলে ও মুজিব নগরের মানুষের সাথে এ বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের একটি গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ জাতিসংঘ কাগজে কলমে (Officially) বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও বাস্তবে তা অস্বীকার করতে পারেনি। বর্তমান অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো একটি সাধারণ বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হবে।

বঙ্গবন্ধু বিচার প্রশ্নে জাতিসংঘের সাথে প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ

জুলাই -এর শেষ সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের আয়োজন চলছে।[৫] এ সংবাদ প্রকাশের পর পরই মুজিবনগর সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ মুজিব হচ্ছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রতীক পুরুষ। তাই উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার জন্য বিশ্ববাসী ও বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে আবেদন জানান।[৬] ৯ আনুষ্ঠানিকভাবে আগষ্ট পাকিস্তান শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নয়াদিল্লীর সাথে ওয়াশিংটনের সময়ের ব্যবধান সাড়ে দশ ঘন্টার মত। ফলে নয়াদিল্লীতে মৈত্রী চুক্তি সংক্রান্ত ঘোষণার পর ঐ দিন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুজিবের বিরুদ্ধে কোন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেয়।[৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382730

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ মহাসচিব ১০ আগষ্ট শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে সামরিক জান্তার উদ্যোগে হস্তক্ষেপ করেন। এ প্রসঙ্গে মহাসচিব সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন,

> The Secretary General feels that it is an extremely sensitive and delicate matter which falls within the competence of the judicial system of a member state in this case, Pakistan. It is also a matter of extraordinary interest and concern in many quarters, from a humanitarian as well as from a political point of view. The Secretary General has received and is still receiving almost everyday expressions at serious concern from representatives of Governments about the situation of East Pakistan and there is a general feeling that the restoration of peace and normalcy in the region is remote unless some kind of accommodation is reached. The Secretary General Shares the feelings of many representatives that any developments concerning the fate of Sheikh Mujibur Rahaman will inevitably have repercussions outside the borders of Pakistan.[৮]

মহাসচিব বিষয়টিকে শুধু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ারাধীন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেননি। তিনি মনে করেছিলেন যে, রাজনৈতিক গুরুত্ব ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ব্যতিক্রমী বিষয় (Extra –ordinary case)সভ্যতার স্বাভাবিক মানদণ্ডে এবং জাতিসংঘ সনদের মুখবন্ধ বর্ণিত পংক্তিমালা অনুযায়ী এই বিচারের আয়োজন সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল।[৯]

মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যে পত্র বিনিময় ঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রহসনমূলক বিচার প্রশ্নে মহাসচিবের উদ্বেগের বিষয়টি জানতে পেরে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে মওদুদ আহমদ ১৮ আগষ্ট সহকারী মহাসচিবের অফিস (বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়) এর ডিরেক্টর মিঃ ব্রায়ান, ই উরকুহার্ট (Brian E. Urquhart) বরাবরে একটি জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন ঐ বার্তায় তিনি শেখ মুজিবের আইনজীবী হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[১০] ব্রায়ান প্রত্যুত্তরে ২৭ আগষ্ট জানান যে, জাতিসংঘ মহাসচিব তার এখতিয়ারের মধ্যে মুজিবরের নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করছেন এবং পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় সে চেষ্টা করছেন। কারণ মুজিবের বিচারের বিষয়টি

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মহাসচিবের কাছে দারুণ উদ্বেগের বিষয়। ব্রায়ান আরো জানান যে, আইনগত জটিলতার কারণে মওদুদকে মুজিবের আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত করতে মহাসচিব তার Good Office ব্যবহার করতে পারছেন না।[১১]

সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে মুজিবের বিচার পুনরায় শুরু হলে দেখা যায় যে, এ.কে. ব্রোহী এবং তার তিনজন সহযোগীকে মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে একই সময় মওদুদ আহমেদ ব্রায়ানের বরাবর একটি চিঠি লিখেন যে, এক ব্রোহী হচ্ছেন পাকিস্তান সরকার নিযুক্ত আইনজীবী, মুজিবের ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত নন।

মওদুদ লিখেন যে, সনদ অনুযায়ী মহাসচিবের পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থায় অর্থাৎ মহাসচিব যদি তাঁর Good Office ব্যবহার করে মুজিবের সাথে যোগাযোগ করেন, তা হলে মুজিব নিশ্চিত ভাবেই মওদুদকে তার আইনজীবী হিসেবে পেতে চাইবেন।[১২]

জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগ এবং প্রচেষ্টা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেখা যায়, "This time Mujib cann't go unpunished" ইয়াহিয়ার একধরনের মনোভাব হঠাৎ করেই পরিবর্তন আসে। অক্টোবরের শেষে ইয়াহিয়া *Newsweek* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, যদি জাতি তাঁর মুক্তি চায়, তবে তিনি তা পূরণ করবেন। পরবর্তীকালে কিসিঞ্জারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের মনোণীত কোন প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করার বিষয়টি বিবেচনা করতে রাজি আছেন।"[১৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘের মহাসচিবের উদ্বেগ, যুক্তরাষ্টের চাপ এবং মুজিবনগর সরকারের সক্রিয় তৎপরতার কারণে বঙ্গবন্ধুর প্রাণ রক্ষা পায়। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর "প্রহসনমূলক" বিচার বন্ধে মহাসচিবের উদ্বেগ এবং আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার মুখে ১৯৭১ -এর মার্চ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সরকার সবচেয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। অনেকক্ষেত্রে মহাসচিবের ভূমিকা মার্কিন ভূমিকার পরিপূরক ছিল এবং এতদিন পাকিস্তান মহাসচিবের ভূমিকায় সন্তুষ্ট থাকলেও সমকালীন বিশ্বের যশস্বী শেখ মুজিবের প্রাণহানি প্রশ্নে উথান্টের সাবধানবাণী তাদের 'ক্ষিপ্ত' করে তুলে। দেখা যায় ১৫ আগষ্ট পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে মহাসচিবের এই বিবৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর নির্দেশ দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোও মহাসচিবের অব্যাহত নিন্দা জানায়।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রদিনিধি দল

সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশন বসে। এ সময় মুজিবনগর নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রেরণকে কেন্দ্র করে। সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাকের ধারণা ছিল যে, তিনি এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করতে চলেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জনাব মোশতাকের জন্য এটি একটা স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের সাথে তার গোপন যোগাযোগের ইঙ্গিত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়। বিশেষকরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের (State Department) জন আরউইন মুজিবনগর সরকারের একাংশের সাথে গোপন মার্কিন যোগাযোগের বিষয় জানানোর পর খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রেরণের বিষয়টি বাতিল করা হয়।[১৫] মুজিবনগর সরকার তখন মোশতাকের পরিবর্তে যুক্তরাজ্যে ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা মনোনীত করে। ২১ সেপ্টেম্বর মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে লন্ডনে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জানান যে, সাধারণ পরিষদে বংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিচারপতি চৌধুরী এ প্রতিনিধিদলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন অবিলম্বে নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য হলেন ঃ আব্দুস সামাদ আজাদ (সংসদ সদস্য), মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী (সংসদ সদস্য), সিরাজুল হক (সংসদ সদস্য), আসহাবুল হক (প্রদেশিক পরিষদ সদস্য), ফণিভূষণ মজুমদার (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য), ফকির শাহাবুদ্দিন (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য), অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি), ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক (উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক রেহমান সোবহান, এ.এম. আবুল ফতেহ (রাষ্ট্রদূত), খররুম খান পন্নী (রাষ্ট্রদূত), সৈয়দ আনোয়ারুল করিম (কূটনৈতিক), আবুল মাল আবদুল মুহিত (কূটনৈতিক) ও এ. এইচ মাহমুদ আলী। এ. এইচ. মাহমুদ আলী ১৬ সদস্য বিশিষ্ট মূল প্রতিনিধি দলে ছিলেন না। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা যৌথ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানি দূতাবাস থেকে প্রথম আনুগত্য প্রকাশকারী এই তরুণ কূটনৈতিককে প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।[১৬] (প্রতিনিধিদলের পরিচিতির জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল ২৫ সেপ্টেম্বর নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন । এবং ফকির শাহাবুদ্দিনকে দলের সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন। যেহেতু তখন বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য ছিল না তারই প্রেরিত প্রতিনিধিদল সরকারি প্রতিনিধিদল ছিলনা। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ভবনে প্রতিনিধিদলের প্রবেশ কষ্টসাধ্য ছিল। বিশেষকরে পাকিস্তান এই প্রতিনিধি দলটিকে Rebellious elements হিসেবে চিহ্নিত করতে

Dhaka University Institutional Repository

চাইতো।[১৭] এ বৈরী পরিবেশে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এ দলটি জাতিসংঘ প্রাঙ্গণে সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। দলনেতা আবু সাঈদ চৌধুরী তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "প্রতিদিন সকালে কয়েক মিনিটের জন্য বেলমান্ট প্লাজার সভাকক্ষে আমাদের প্রতিনিধিদলের বৈঠক বসত। সমগ্র প্রতিনিধিদলকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়। যাতে করে অল্প সময়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগাযোগ সমাপ্ত করা যায়। বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে ভারতের সাহায্য নিয়ে জাতিসংঘের দপ্তরে যাওয়া ঠিক হবে না। কেননা পাকিস্তানিরা নানা রূপ প্রচারণা করেছে।[১৮]

বিচারপতি চৌধুরীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথমত, স্বাধীনতার স্পৃহায় উদ্দিপ্ত প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, সরাসরিভাবে ভারতের সাহচর্য এড়িয়ে যাওয়া। সন্দেহ নেই যে, এটা অত্যন্ত দূরদর্শিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কারণ জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশ যেমন চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক কাঠামোতে ফেলে আলোচনা করতে চাইতো। এমনি অবস্থায় ভারতের সরাসরি সাহায্য নেয়া শুধু দৃষ্টিকটুই হত না, বরং পাকিস্তান ও তার মিত্রদের বৈরী প্রচারণায় অনুকূলে যেত।

তবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। ভিন্ন একটি পদ্ধতিতে তারা বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠিত করেন। তারা সে বছর (১৯৭১) জাতিসংঘে সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ডঃ যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সহায়তায় জাতিসংঘ ভবনে প্রবেশ করতেন। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী লিখেছেন,

> তার (ডঃ ব্যানার্জী) সঙ্গে এই ব্যবস্থা হল যে আমরা প্রত্যহ জাতিসংঘের গেটে গিয়ে তাকে ফোন করব এবং তিনি টেলিফোন গেটে কর্মরত অফিসারদের আমাদের জন্য প্রবেশপত্র দিতে বলবেন। প্রবেশপত্রে শুধু তারিখ থাকে, সময়ের উল্লেখ থাকে না অথবা কোন জায়গা সীমিত করে দেয়া হয় না। আমাদের প্রতিনিধি দলের অন্যান্য গ্রুপও ডঃ ব্যানার্জীর নিকট থেকে অনেক প্রবেশ পত্র নিয়েছেন, তবে তারা সাধারণত সুতাবাসগুলোতে যেতেন। সাধারণত সকালে প্রবেশপত্র নিয়ে ভিতরে যেতাম। ডেলিগেশন ও অন্যান্য জায়গায় প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতে অসুবিধা হত না।[১৯]

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে জাতিসংঘে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পশ্চিমবঙ্গের এই বাঙালি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শুধু তাই নয় ডঃ ব্যানার্জী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জাতিসংঘ ভবনে অবস্থিত সাংবাদিক সমিতি অফিস ব্যবহার করতে দিতেন। দ্বিতীয়ত, ডঃ ব্যানার্জীর সহায়তায় জাতিসংঘ প্রেস উইং -এ অবস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বিচারপতি মুজিবনগর সরকারের উদ্দেশ্যে ঘন ঘন তার বার্তা পাঠাতেন। ফলে তারবার্তা পাঠানো সুলভ ও সহজলভ্য হয়েছিল এবং উদ্বিগ্ন মুজিবনগর সরকারের সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সাথে স্থাপিত হয় সাম্বলীল সংযোগ।

জাতিসংঘ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সাংবাদিক সম্মেলন

অক্টোবর মাসে ৭৭৭ জাতিসংঘ প্লাজার বিপরীত দিকে চার্চ সেন্টারে একটি হলে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের একটি পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার কৌতূহলবশত বিপুল সংখ্যক সাংবাদিকের সমাবেশ ঘটে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোতে কোন ধরনের আপোষ সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা বলেন, "We have reached a point of no return" বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনটি পূর্বশর্তের কথা বলা হয়। এগুলো

১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি।

২) শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তিদান।

৩) ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে অবিলম্বে অপসারণ।

দুই অঞ্চলের ভাষা, অভ্যাস, চিন্তাধারা, আদর্শ এবং সংস্কৃতি ভিন্নতার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা বলেন, জাতিসংঘের সংজ্ঞায় আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি" এ প্রসঙ্গে তিনি জাতিসংঘের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন,

> প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতিসংঘের সনদে ঘোষিত হয়েছে। একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে সেই ধারা অনুসারে বাঙ্গালি জাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘের কর্তব্য ইয়াহিয়া খানের নিষ্ঠুর নিপীড়নের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা। আমরা গণহত্যা বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি জাতিসংঘ মানবাধিকার লংঘন, ঔপনিবেশিকতা, সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাবে বাংলাদেশ।[২০]

এ সংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে জানাতে পারেন উপস্থিত সাংবাদিকরা। উপমহাদেশে বিদ্যমান সংকটের মূল স্নায়ুকেন্দ্রে যে বাংলাদেশ এবং তার মানুষ এটাই সাংবাদিকরা বাঙালি নেতৃবৃন্দ ও বাঙালি কূটনৈতিকদের কাছ থেকে জানতে পারেন। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রশ্নের কিছু উত্তর দেন জনাব আবদুস সামাদ আজাদ (এম. এন. এ) তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, বাংলাদেশ স্থায়িত্ব পাবে (Viable) কি না ? প্রত্যুত্তরে জনাব আজাদ বলেছিলেন যে, "অবশ্যই। কারণ পাকিস্তানের প্রথমদিকে তো আমাদের (পূর্ব বাংলার) রফতানী আয় বেশী ছিল এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানকে উন্নত করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান রফতানী দ্রব্য পাট বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়।"[২১]

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল তাদের বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে যেয়ে মিশ্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ কেউ অত্যন্ত সাবধানে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছেন। আবার কেউ তাদের কথা শুনতেই চাননি। অন্যদিকে কিছু দেশের প্রতিনিধি অত্যন্ত আগ্রহ এবং মনোযোগের সাথে বাংলাদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের কথা শুনেছেন।[২২]

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের কর্মতৎপরতায় জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি নাখোশ হন এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে অভিযোগ করেন যে, 'বাংলাদেশী ব্যক্তিরা' জাতিসংঘ ভবনে লবি করছে। তিনি তাদের জাতিসংঘ ভবন থেকে বহিষ্কারের দাবি উত্থাপন করেন।[২৩] একই সময়ে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের বাঙালি সদস্য শাহ আজিজুর রহমান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে একটি বৈঠকের প্রস্তাব করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিষয়টি নিয়ে প্রতিনিধিদলের বৈঠকে আলোচনা করলে সকলেই একযোগে এ প্রস্তাবকে "দূরভিসন্ধিমূলক" বলে অভিহিত করেন। প্রবাসী বাঙালি লেখক আব্দুল মতিন বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "সদস্যরা একযোগে শাহ আজিজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এবং তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা কর্তৃক পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সদস্যকে বাঙালি বলে স্বীকৃতি দেয়া উচিত হবে না।"[২৪]

নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে আবু সাঈদ চৌধুরীর অংশগ্রহণ প্রশ্নে বিতর্ক

ভারতীয় উপমহাদেশে ৩ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হয়। ফলে একদিন পর ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশন শুরু হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সভা বসার পূর্বক্ষণে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য এক পত্রে আবেদন জানান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ পত্রটির অনন্য সাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। এতে সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, কারণ ও জাতিসংঘের ভূমিকা এবং কর্তব্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ৪, ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি, কিন্তু তখন এ

Dhaka University Institutional Repository

পত্রটিকে নিরাপত্তা পরিষদের Official Document হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি উচ্চারিত হল। পত্রটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে উদ্বৃত করা হলঃ

> ... At the heart of these developments lies the war which has been waged since 25 March 1971 by the Government of Pakistan against 75 million people of Bangla Desh, formerly East Pakistan. Despite the full reports which have been appearing in the international press regarding this war and the resulting flight of millions of people from Bangla Desh into the neighbouring territories of India and consequent international tension, the United Nations has not addressed itself so far to this basic problem, nor has it so far taken into account the party most concerned in this tragic and dangerous crisis namely, the 75 million people of Bangla Desh. There can be no proper evaluation of the present situation, its causes, present state and future solution, without Bangla Desh being given a hearing.[২৫]

পত্রটির বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশ ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের স্বপক্ষে কিছু মৌল বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়। (এক) সাড়ে সাত কোটি বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তান ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে যে যুদ্ধ শুরু করেছে সেটাই হল এ সংকটের মূল কারণ (দুই) জাতিসংঘ এ পর্যন্ত মূল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগি হয়নি। কারণ এ বিয়োগান্তক ও মারাত্মক সংকটের প্রধান পক্ষ বাংলাদেশের মানুষকে বিবেচনায় আনেননি। (তিন) চলমান সংকটের বর্তমান পরিস্থিতি, এর প্রকৃতি, এর কারণ এবং ভবিষ্যৎ সমাধান কোন কিছুই সম্ভব নয়, যদি না বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য এখানে শোনা না হয়। (চার) বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদের সামনে একটি বিবৃতি পাঠের জন্য ও বিচারপতি চৌধুরী অনুরোধ জানান।

নিরাপত্তা পরিষদের সভা যখন শুরু হল তখন সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা জ্যাকব মালিক প্রস্তাব করেন যে, বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধির বক্তব্য শোনা হোক। জ্যাকব মালিকের এ প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদে একটি দীর্ঘ বিতর্ক হয়। এবং পরিষদের দলিল পত্রের বিশ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে এ সম্পর্কিত আলোচনার বিবরণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিভিন্ন দেশ কী দৃষ্টিতে দেখছে তার একটি চিত্র এসব বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যাবে। সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক দুটো প্রস্তাব করেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পত্রটি নিরাপত্তা পরিষদের ডকুমেন্ট হিসেবে বিলি করা হোক ;

(খ) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পরিষদে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হোক।[২৬]

এ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে একটি আকর্ষণীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে নয়টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। তাদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(১) ইতালী, জাপান, সোমালিয়া, সিরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রথম প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানায়; কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।

(২) আর্জেন্টিনা ও চীন উভয় প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

(৩) পোল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়।[২৭]

দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ দেশই নীতিগতভাবে বাংলাদেশের বক্তব্য বিলি হোক এ বিষয়টির বিরোধিতা করেনি। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ও প্রথম প্রস্তাবের পক্ষে রুলিং দেন। তবে অনেক দেশই বাংলাদেশের প্রতিনিধির বক্তব্য পড়ে শোনা হোক এই মতের বিরোধিতা করেন। যেমন ইতালীর প্রতিনিধি ভিনচি (Vinci) বলেন "I think we should restrict our deliberation to the members of the Council and the two main parties concerned."[২৮] অর্থাৎ ইতালীর প্রতিনিধি ভারত ও পাকিস্তানকে বিরোধের দুই পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বাংলাদেশকে বিরোধের একটি পক্ষ হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বক্তব্য রাখার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর মতে বিষয়টি পরে বিবেচনা করা হবে। প্রায় একই রকম মনোভাব ছিল জাপানের। জাপানের প্রতিনিধি নাকা গাওয়া (NAKA GAWA) এর বক্তব্য হলোঃ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা না করে আলোচনার অগ্রগতি অর্জনের জন্য অন্তত এ মুহূর্তে জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন কোন দেশের বা সংস্থার প্রতিনিধির অংশগ্রহণ সীমিত রাখা প্রয়োজন।[২৯]

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ ভিনসি ও নাকা গাওয়ার সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেন, "to defer extending an invitation .. to this Bangla Desh delegation".[৩০] অর্থাৎ বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের নেতার অংশগ্রহণের বিষয়টি স্থগিত রাখার কথা বললেন জর্জ বুশ। সোমালিয়ার প্রতিনিধি ফারাহ (FARAH) এবং সিরিয়ার প্রতিনিধি তোমেহ (TOMEH) এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির

Dhaka University Institutional Repository

রুলিংকে সমর্থন জানান। উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতির রুলিংকে চ্যালেঞ্জ করার পর নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপ্রণালী ৩০ ধারা অনুযায়ী এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি ওরটিজ ডি রোজাস (Ortiz de Rojas) বলেন, বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হলে একটি বিপদজনক নজির সৃষ্টি হবে। এবং এটা জাতিসংঘের সদস্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল হবে। কিন্তু আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি অবশ্য স্বীকার করেন যে, জাতিসংঘের ইতিহাসে সংগঠনটির সদস্য নয় এমন জাতি বা জনগণের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদানের জন্য দশ জনের বেশী প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশ প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য হলো যে, পূর্ব বাংলায় এ ধরনের পরিস্থিতি নেই তাই সেখানকার প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত নয়। এমন কি তিনি নিরাপত্তা পরিষদের ডকুমেন্ট হিসেবে বিচারপতি চৌধুরীর পত্রটি বিলি হোক তারও বিরোধিতা করেন।[৩১]

তবে চীনা প্রতিনিধি পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি বক্তব্য রেখেছিলেন। নিরাপত্তা পরিষদের কোন প্রতিনিধিই চীনের মত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কটাক্ষ করেনি, যতটা চীন করেছে। চীনা প্রতিনিধি হুয়াং (HUANG) বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে, "পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি" বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, বিচারপতি চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ হলো একটি সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। তাই চীনা প্রতিনিধি বাংলাদেশের প্রতিনিধির বৈঠকে অংশগ্রহণকেই বিরোধিতা করেননি, পরিষদে যাতে তার পত্রটি বিলি না করা হয়, সে জন্যেও তৎপর ছিলেন।[৩২]

আলোচনা ও বিতর্কের পর নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি জ্যাকব মালিকের প্রথম প্রস্তাব অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের ডকুমেন্ট হিসেবে বিচারপতি চৌধুরীর পত্র বিলি করার দাবী মেনে নেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় বিচারপতি চৌধুরী অংশগ্রহণের দাবী প্রয়োজনীয় সমর্থন না পাওয়ায় সভাপতি গ্রহণ করেনি। সোভিয়েত প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপ্রণালীগত ৩৯ ধারা অনুযায়ী পুনরায় চ্যালেঞ্জ করেন। ধারা ৩৯ এ বলা হয়েছে, " The security council may invite members of the secretariat or other persons, whom it considers complement for the purpose, to supply it with information or to give other assistance examining matters within its competence."[৩৩]

মালিক যুক্তি উত্থাপন করে বলেন যে যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদের ৯টি সদস্য রাষ্ট্র অবনতিশীল পরিস্থিতি বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য পরিষদের জরুরী বৈঠকের আহবান জানিয়েছে, সেহেতু বিচারপতি চৌধুরীর অংশগ্রহণে বাধা কোথায়? কারণ গোটা পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (essence) কি ? গোটা বিষয়টি

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনার আগে এই বৈশিষ্ট্য জেনে নেওয়া উচিত নয় কি? জ্যাকব মালিক চীনা প্রতিনিধি হুয়াং কর্তৃক বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যেভাবে 'বিদ্রোহীদের আন্দোলন' বলে চিহ্নিত করেছেন তার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, যদি পরিষদ পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা করতে চায় তবে পরিষদের উচিত শুরুতেই পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনা। তিনি বলেন, এ প্রতিনিধি হচ্ছেন সেই দলের প্রতিনিধি যে দলটি পাকিস্তানের সংসদীয় নির্বাচনের ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে বিজয়ী হয়েছেন এবং প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সবকটি আসনে জয়লাভ করেছে।[৩৪]

পোল্যান্ডের প্রতিনিধি কুলাগা (KULAGA) সোভিয়েত প্রতিনিধি মালিককে সমর্থন করে বলেন, পরিষদের এজেন্ডাভুক্ত সমস্যাটি একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন, বিষয়টির প্রতি বিভিন্ন দেশ যে পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছে সেখান থেকে সরে এসে একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তৈরী করা প্রয়োজন।[৩৫] ভারতের প্রতিনিধি সমরসেন তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সোভিয়েত প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার অধিকার তার নেই। এজন্য বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। সমরসেন বলেন" তারা (পূর্ববাংলার জনগণ) হচ্ছেন মূল ভুক্তভোগী...। যদি আমরা তাদের মতামত না জানি তবে আমি জানি না আমরা কি আলোচনা করতে যাচ্ছি?[৩৬]

বিস্তারিত আলোচনার পর নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি বিষয়টি সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেন। সভাপতি তার পূর্ববর্তী রুলিং- এ স্থির থাকেন। অর্থাৎ পরিষদে ডকুমেন্ট হিসেবে বিচারপতি চৌধুরীর পত্রটি বিলি করা হবে। কিন্তু তাকে বক্তব্য দানের সুযোগ দেয়া হবে না এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী দিন (৫ ডিসেম্বর) যখন পরিষদের বৈঠক আবার শুরু হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপন করে। ঐ দিন চীনা প্রতিনিধি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, দেশ দুটি "Signing a duet openly trumpeting for the dismemberment of Pakistan in a sinister attempt to impose upon the United Nations the so called Bangla Desh which they have created"[৩৭] পাকিস্তানের প্রতিনিধি আগাশাহী সোভিয়েত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোরালো আক্রমণ চালান।

তার বক্তব্য হলো 'ফথিত' এ প্রতিনিধিদল কে স্বীকৃতি দিলে নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতায় ছুরিকাঘাত করবে।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

চীন এবং পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক বক্তব্য সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় দিনে ও (৬ ডিসেম্বর) নিরাপত্তা পরিষদের সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি আবার উত্থাপন করে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি কারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্য ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছিলেন।

ওপরে আলোচনায় রাজনৈতিক প্রশ্নে মুজিবনগর সরকারের সাথে জাতিসংঘের যোগাযোগ এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়ের একটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি প্রধান বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রধান প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রশ্নে জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী মহাসচিব উথান্টের উদ্বেগপূর্ণ বিবৃতি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল। দুর্বিনীত সামরিক জান্তা যে সকল কারণে 'রায় পূর্ব নির্ধারিত' বিচারের আয়োজন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল তার মধ্যে মহাসচিবের প্রকাশ্য উদ্বেগ একটি বড় কারণ তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘে মুজিবনগর সরকার প্রেরিত প্রতিনিধিদলের সাফল্য কতটুকু ছিল ? সাফল্য সম্পর্কে মোটামুটি মিশ্র বক্তব্য এসেছে। দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বাহ্নে খুব আশাবাদী ছিলেন প্রতিনিধিদলের রেহমান সোবহান। তাঁর আশা ছিল যে, সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে একটি প্রস্তাব (Resulation) নেয়ার পক্ষে সমর্থন আদায় সম্ভব হবে অথবা কোন কোন অধিবেশন ও কমিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হবে। কিন্তু বাস্তবে ততটা ঘটেনি। রেহমান সোবহানের ভাষ্য হলো; "জাতিসংঘের বেশিরভাগ সদস্য দেশই নিরুৎসাহী ছিল তাদের অন্য আরেকটি দেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে। তারা এটিকে মনে করেছিলেন একটি দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ হিসেবে।"[৩৯]

কিন্তু জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা মনে করেন যে, এ প্রতিনিধিদলের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের সাহায্য ছাড়া প্রতিদিন জাতিসংঘ ভবনে তাঁরা প্রবেশ করতেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে বক্তব্য তুলে ধরতেন তার সজীবতা তো অস্বীকার করা যায় না। লবিতে বসে তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করতেন। জাতিসংঘ প্রাঙ্গণে মুজিবনগর প্রতিনিধিদলের সাংবাদিকক সম্মেলন বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যমের শিরোনাম দখল করে নেয়। তাছাড়া এধরনের প্রতিনিধিদল প্রেরণের রাজনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম।[৪০]

তৃতীয়ত, নিরাপত্তা পরিষদের সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো প্রশ্নে যে বিতর্ক হয় তার একটি বিশ্লেষণ দাঁড় করানো প্রয়োজন। কয়েকটি দেশ যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি ৩৯ ধারা মতে দাবী করেন যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে

Dhaka University Institutional Repository

আমন্ত্রণ জানানো হোক। ৩৯ ধারা অনুযায়ী পরিষদ 'ব্যক্তিসমূহকে' (Person) আমন্ত্রণ জানাতে পারে। বিষয়টির দুটি দিক রয়েছে (ক) বিদেশে প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যা বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। কারণ বাংলাদেশকে তখনও কোন দেশ স্বীকৃতি দেয় নি। এ বিতর্ক যখন তৃতীয় দিনে গড়ায় তখন ভারত প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তাছাড়া প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধির মর্যাদায় নিরাপত্তা পরিষদ তখন পর্যন্ত (পরিষদের ইতিহাসে) কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানায়নি।

তবে দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতাকে আমন্ত্রণ জানাতে কোন অসুবিধা ছিল না। বিশেষ করে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানোর ফলে যদি 'তথ্য সংগ্রহ' (Supply with Information) সম্ভব হয়, তবে সে ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের ইতিহাসে এমনি বহু নজির রয়েছে। বাংলাদেশের ঘটনাবলী সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছিল। তথাপি বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি পরিষদের সামনে সত্যিকার পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারতেন। চীন ও পাকিস্তান বিচারপতি চৌধুরীর এ ধরনের উপস্থিতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পরিপন্থী বলে প্রচার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না। কারণ এর আগে নিরাপত্তা পরিষদের এ ধরনের সভায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তাদের স্ব স্ব দেশের (অর্থাৎ পূর্বতন রাষ্ট্রের) নাগরিক ছিলেন এবং তাদের উপস্থিতিকে সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার লঙ্ঘন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়নি। সুতরাং চীন যে বৈধতার প্রশ্ন তুলেছিল তা ছিল সন্দেহজনক। এ মতভিন্নতার কারণে নিরাপত্তা পরিষদ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণের বক্তব্যকে উপেক্ষা করেই আলোচনা শুরু হয়। ভারতীয় প্রতিনিধি সমরসেন পরিহাসের সাথে বাস্তব সত্য তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, "Without hearing the voice of Bangla Desh is like playing Hamlet without the Prince of Denmark"[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মওদুদ আহমেদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, অনুবাদ জগলুল আলম (ঢাকা : ইউপি এল, ১৯৯৩,) পৃঃ ২০৮

২. দেখুন, *মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্র*, উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২) পৃঃ ১২

৩. মাওলানা ভাসানী জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে বলেন "I appeal to you to raise your voice against this brutal superssion of fundamental human freedom and birth right of the people of Bangladesh to to decide their own desting without any interference from west Pakistan." দেখুন, ***Bangla Desh Documents*** (Delhi : Ministry of External Affiars, Government of India. 1971), P. 299

৪. আবুল হাসান মাহমুদ আলীর একান্ত সাক্ষাৎকার; ডিসেম্বর ১৯৯৭। জনাব আলী হচ্ছেন ভারতবর্ষের বাহিরে প্রথম বাঙালি কূটনীতিক যিনি ১৯৭১-এর ২৬ এপ্রিল নিউইয়র্কের পাকিস্তানি মিশনের ডাইস কন্সাল পদ থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি জানিয়েছেন যে, প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন ***Bangladesh League of America*** এবং অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ, বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দান ইত্যাদি দাবিতে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সম্মুখে নিয়মিত বিক্ষোভের আয়োজন করা হত। এবং এসব বিক্ষোভের পর জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের হাতে স্মারকলিপি হস্তান্তর করা হত। পাকিস্তানি গবেষকরাও এই বিক্ষোভের কথা স্বীকার করেছেন। যেমন , "Meanwhile an application was sent to the Secretary general of the United Nation for admission of Bangaladesh to the world Body." দেখুন Sadfdar Mahmood, ***Pakistan Divided*** (Delhi: Alpha Bravo, 1983) P.123

৫. বিবিসি প্রচারিত এক খবরে বলা হয় যে, শীঘ্রই সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এ খবরটি মুজিবনগর থেকে প্রথম *মুক্তিযুদ্ধ* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। দেখুন *মুক্তিযুদ্ধ* (মুজিবনগর) ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ২৫ জুলাই ১৯৭১।

৬. বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বেতার ভাষণে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের বরাবরে আকুল আবেদন জানান। দেখুন *জয়বাংলা* (মুজিবনগর) ৩০ জুলাই, ১৯৭১।

৭. ***Asian Record*** (India) 6-12 August, 1971.

৮. ***International Hearld Tribune*** (Paris), 10 August 1971.

৯. একজন গবেষক যথার্থই বলেছেন, " The trial (mujibs) is against the Fundaments of the United Nation as put in the Preamble of the UN charter."Yatindra Bhatangar, ***Mujib : The Archetect of Bangladesh*** (Delhi : 1973) P.184-85.

Dhaka University Institutional Repository

১০. মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্র, উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *দলিল* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০৪

১১. ঐ, পৃঃ ৮০৬-

১২. *পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দলিলপত্র,* মুজিবনগর সরকার, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

১৩. Henry Kissinger, ***White House Years*** (Delhi : Vikas Publishing House, 1979) P.187.

১৪. জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া হলো যে, " Pakistan's Permanent Representative at the United Nations has been instructed to lodge a strong protest with the UN Secretary general U –Thant against the statiment made on his behalf regarding the trial of Sheikh Mujibur Rahman." ***Pakistan Observer,*** August 16, 1971. এছাড়া ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামাত-ই ইসলামীর প্রতিক্রিয়া ছিল আরো তীব্র। তাদের মতে "বিশ্বসংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে যে মর্যাদা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন এই বিবৃতির মাধ্যমে তিনি তা নষ্ট করে ফেলেন।" দেখুন, *সংগ্রাম,* ২১ আগষ্ট, ১৯৭১।

১৫. পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জনাব মোশতাকের নিউইয়র্ক সফর বাতিলের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদলের নেতা ও সদস্যদের পরিচিতির জন্যে দেখুন *জয়বাংলা* (মুজিবনগর) ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (ঢাকা, ইউ পি এল ১৯৯০) পৃঃ ১৬৫।

১৭. আবুল মাল আব্দুল মুহিতের একান্ত সাক্ষাৎকার অক্টোবর ১৯৯৬ এবং মাহমুদ আলীর একান্ত সাক্ষাৎকার ১৯৯৭। জনাব মুহিত ও মাহমুদ দুজনই তাদের অভিজ্ঞার কথা জানিয়েছেন যে, পাকিস্তান ও চীন যৌথভাবে সাধারণ পরিষদের লবিতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্পর্কে এই প্রচারণা চালাতো। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, "আমাদের সংগ্রাম ভারতের উস্কানিতে শুরু হয়েছে এই সন্দেহ পাকিস্তান প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।" দেখুন, আবু সাঈদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৬৯।

১৮. আবু সাঈদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৬৭

১৯. আবু সাঈদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৬৮। আবু সাঈদ চৌধুরীর দলের সদস্য এ এইচ মাহমুদ আলী জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের হয়ে কর্মতৎপরতা চালানোর জন্যে ডঃ ব্যানার্জীর প্রভূত সাহায্যের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, "তিনি (ডঃ ব্যানার্জী) ছিলেন নেতাজি সুভাস বসুর সহকর্মী। তিনি বলতেন, আপনি যখনই জাতিসংঘ ভবনে আসতে চান বা কোন খবর চান আমার সাহায্য পাবেন। আপনি আসুন আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই বিভিন্ন জনের। ...ব্যানার্জীকে অনেক দেশের কূটনৈতিক সম্মান করতো। ইনি জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তি। যাহোক উনার মাধ্যমে জাতিসংঘ ভবনে প্রবেশ করতে আর কোন বাঁধা রইল না"। একান্ত সাক্ষাৎকার, ঐ।

২০. আবু সাঈদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৭৯ এবং জনাব মুহিত ও জনাব মাহমুদ আলীর ঐ সাক্ষাৎকার।

২১. আব্দুস সামাদ আজাদের একান্ত সাক্ষাৎকার, জানুয়ারী ১৯৯৮ এবং আবু সাঈদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

২২. জনাব মুহিত ও জনাব মাহমুদ আলীর একান্ত সাক্ষাৎকার । আরো দেখুন A.M.A. Muhith, ***Emergence of Bangladesh*** (Dhaka : Bangladesh Books International Limited, 1st Edition, 1978) PP. 270-27

২৩. ***Pakistan Observer,*** 2 October 1971

২৪. আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি ঃ বাংলাদেশ ১৯৭১* (লন্ডন : র‍্যাবিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশনস, ১৯৯১) পৃঃ ১৫৬

২৫. UN Doc, S/10415 (Original English)

২৬. UN Doc, S/PV 1606, Para

২৭. ***Ibid,*** Para-3 to 50

২৮. ইতালির প্রতিনিধির বক্তব্যের জন্য দেখুন UN Doc, S/pv 1606 Para, 3.

২৯. জাপানের প্রতিনিধির বক্তব্যের জন্য দেখুন UN Doc, S/pv 1606, Para 17,

৩০. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশের বক্তব্যের জন্য দেখুন ***Ibid***, Para 187-200,

৩১. আর্জেন্টিনার প্রতিনিধির বক্তব্যের জন্য দেখুন ***Ibid***, Para 12;15

৩২. চীনের প্রতিনিধির বক্তব্যের জন্য দেখুন ***Ibid,*** Para 235-238

৩৩. দেখুন নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধির ৩৯ নং ধারা (Rules of Procedure, 39)

৩৪. সোভিয়েত প্রতিনিধির জ্যাকব মালিকের বক্তব্যের জন্য দেখুন UN Doc, S/pv 1606, Para 34,

৩৫. পোল্যান্ডের প্রতিনিধির বক্তব্যের জন্য দেখুন UN Doc, S/pv 1606, Para 18, 19,20,

৩৬. সমর সেনের বক্তব্যের জন্য দেখুন ***Ibid,*** Para 51-52

৩৭. চীনা প্রতিনিধির বক্তব্যের জন্য দেখুন UN Doc, S/pv 1606, Para 20, 28,

৩৮. আগাশাহীর বক্তব্যের জন্য দেখুন ***Ibid,*** Para 105, 130-132

৩৯. রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য,* অনুবাদ ফরিদ কবির, (ঢাকা ঃ ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯৪) পৃঃ ১৩৪-১৩৫ ।

৪০. জনাব মুহিত ও মাহমুদ আলীর ঐ সাক্ষাৎকার।

৪১. UN Doc, S/pv 1606, Para 51

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৪ দিনের সর্বাত্মক যুদ্ধ (১৯৭১), নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদের জরুরি অধিবেশন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবরুদ্ধ বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং "সত্তর কোটি মানুষের যুদ্ধ" শিরোনামে এই সামরিক সংঘর্ষের খবর বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হতে থাকে। এই সর্বাত্মক যুদ্ধ চলে ১৪ দিন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, এ সময় জাতিসংঘ অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। কারণ যুদ্ধ যখন বাধল তখন, "all super powers displayed their cards in the game."[১] এ সময় নিরাপত্তা পরিষদের ক্রমাগত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উত্থাপিত হয় বিভিন্ন প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব। নিরাপত্তা পরিষদে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বৃহৎ শক্তি চীন পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। একপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। অন্য দুই বৃহৎ শক্তি ফ্রান্স ও ব্রিটেন পরিষদে বিতর্কে অংশ নিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ এবং যেকোন প্রস্তাবে ভোট দানে বিরত থাকে। ফলে নিরাপত্তা পরিষদে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তিন দিনে ২০ ঘণ্টা আলোচনা, বিতর্ক ও ভোট গ্রহণের পর নিরাপত্তা পরিষদ থেকে এজেন্ডাটি সাধারণ পরিষদে স্থানান্তরিত হয়। সাধারণ পরিষদে 'শান্তির জন্যে ঐক্য ফর্মূলা' এর আওতায় একটি প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে সুখকর কোন বিষয় ছিল না। সমকালীন বিশ্বব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কারণে এই প্রস্তাবটি পাস হয়। কিন্তু বিরোধের অন্যতম পক্ষ ভারত ও বাংলাদেশ এটি গ্রহণ করেনি। ফলে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় দফা নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহবানে উদ্যোগ নেয়। এ পর্যায়ে ১২ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিরতি দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে উপমহাদেশের পরিস্থিতির মৌল রূপান্তর ঘটে। তখন নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরাও বাস্তবতাকে মেনে নেয় এবং ২১ ডিসেম্বরের গৃহীত প্রস্তাবে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য ১৫ ডিসেম্বর সোভিয়েত ব্লকের দেশ পোল্যাণ্ড একটি সংশোধিত প্রস্তাবে পাকিস্তান ও তার পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কিছুটা ছাড় দেয়। যদিও ভুট্টো প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন নি।

বর্তমান অধ্যায়ে কতকগুলো বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হবে। প্রথমত, নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম দফা বৈঠকে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহে বিভিন্ন দেশের অবস্থান কোন পক্ষে তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেয়া হবে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ পরিষদে "শান্তির জন্য ঐক্য ফর্মুলা" এর আওতায় গৃহীত প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হবে। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় দফা নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

করে পোল্যাণ্ডের প্রস্তাব নিয়ে চলতি ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তার একটি বিশ্লেষণ দেয়া হবে। সবশেষে এই অধ্যায়ের মৌল বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬ তম অধিবেশন

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবার পর বিশ্বের এই অন্যতম জনবহুল অঞ্চলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন দেশ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে তৎপর হয়ে ওঠে।[২] এ সময় ভারত ও পাকিস্তান জাতিসংঘ মহাসচিবের বরাবরে আগ্রাসনের বিষয়টি অবহিত করে।[৩] ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ অনানুষ্ঠানিক আলোচনার পর উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে একটি জরুরি অধিবেশন আহ্বানের জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে অনুরোধ জানায়। জাতিসংঘ মহাসচিবও পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্যে পরিষদের সভাপতিকে একই অনুরোধ জানান।[৪]

৪ ডিসেম্বরে শুরু হয় নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬ তম অধিবেশন। নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা শুরু হলে বাংলাদেশের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রশ্নে একটি নাতিদীর্ঘ বিতর্ক হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং এতে দেখা গেছে যে, তাঁকে পরিষদে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ না দেয়া হলেও তার প্রেরিত একটি পত্র পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর অব্যবহিত পরে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রদানের আহবান জানানো হয়। প্রথমে বক্তব্য প্রদান করেন পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত আগাশাহী। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় ভারতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদের ২(৪) ও ২(৭) ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন। বক্তব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে জাতিসংঘকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান জানান।[৫] ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সমর সেন শুরুতেই পাকিস্তানি প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে বলেন যে, তিনি সামরিক সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন না এবং তার প্রতিপক্ষ মূল সমস্যা এড়িয়ে ভারতকে অযথা অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে অস্ত্রের মুখে দমিয়ে রাখার ফলে এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ইয়াহিয়া খান স্বয়ং শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করেছেন, সেখানে আজ কেহই জানেন না যে তিনি জীবিত না মৃত। তিনি বাঙালিদের স্বাধীনতাকে এই যুক্তিতে সমর্থন করেন যে, বাঙালিরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে অথচ ক্ষমতা তাদের দেয়া হয়নি। ফলে তারা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনও করেছে, কিন্তু তাদেরকে দমন করার জন্যে গণহত্যা চালানো হয়েছে। ফলে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ। যুদ্ধ বিরতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুদ্ধ বিরতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয় বরং তা হবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশের মধ্যে।[৬]

ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রদানের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানোর অভিযোগ করেন। তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যার মধ্যে ৭টি পয়েন্ট ছিল। এর মধ্যে চারটি হলো উল্লেখযোগ্যঃ

ক. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ;

খ. উভয় দেশের সেনাবাহিনীকে নিজ নিজ সীমান্তে ফিরিয়া আনা ;

গ. ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েন ;

ঘ. শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্যে বিবদমান পক্ষগুলোকে আহবান।[৭]

মার্কিন প্রস্তাবটি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য আলোচনায় অংশ নেয়। এই আলোচনা ও বিতর্কের পর পরিষদের সভাপতি ৪ ডিসেম্বর রাত ১১ টায় পরবর্তী দিন ৫ ডিসেম্বর রোববার দুপুর ১২.০৫ ঘটিকা পর্যন্ত পরিষদের বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করেন।[৮] একদিন পর পরিষদের মুলতবি অধিবেশন শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র স্বীয় প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধিতা করে বলে যে, প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি মার্কিন প্রস্তাবের পাল্টা আরেকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে বলা হয় ঃ

ক. পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন যা সেখানে বৈরিতার অবসান ঘটাবে ;

খ. পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সকল প্রকার সন্ত্রাস বন্ধ করা প্রয়োজন ;[৯]

সোভিয়েত প্রস্তাব উত্থাপনের পর পরিষদের সভাপতি প্রথম মার্কিন প্রস্তাবের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে ভোট গ্রহণ করেন। হাত তুলে ভোটাভুটি সম্পন্ন হয় এবং নিম্নোক্ত ফলাফল বেরিয়ে আসে ;

প্রস্তাবের পক্ষে	ঃ	আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্ডি, চীন, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, সিরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র
প্রস্তাবের বিপক্ষে	ঃ	সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ড
ভোটদানে বিরত	ঃ	ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য[১০]

দেখা যায় যে, স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে এটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ১০৬ তম ভেটো। ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৭ অধিবেশন

এই অধিবেশনের বিশেষত্ব হলো যে, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় এমন দুটো দেশ আফ্রিকা থেকে তিউনেসিয়া এবং এশিয়া থেকে সৌদি আরবকে আলোচনা করার সুযোগ দেয়া হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির আমন্ত্রণে তারা অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন।

এই অধিবেশনে চীন একটি খসড়া প্রস্তাব উথাপন করে। এ প্রস্তাবে ভারতকে একটি আগ্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তথাকথিত বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য চীন ভারতের নিন্দা করে। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের ভূখণ্ড জবরদখলকারী ভারতীয় সেনাবাহিনী শর্তহীন ও ত্বরিত প্রত্যাহারের দাবি জানায় চীন।[১১] চীনের এই বক্তব্য উথাপনের পর আফ্রিকা মহাদেশের আমন্ত্রিত প্রতিনিধি তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রদূত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, পরিষদের উচিত হবে যুদ্ধ বিরতির আহবান জানানো যাতে সনদের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। এশিয়া থেকে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি সৌদি রাষ্ট্রদূত জামিল বারুদি ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত বন্ধে বৃহৎ শক্তিগুলোর পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করেন। তিনি সরাসরি বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে এবং চীন ও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ নেয়ায় পরিবদে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। সৌদি প্রতিনিধি বৃহৎ শক্তিগুলোর রাজনীতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে এশীয় রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক অনুষ্ঠানের আহবান জানান।[১২]

সৌদি প্রতিনিধির বক্তব্যের পর সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক বলেন যে, সমস্যাটির মৌল প্রকৃতি অনুধাবন না করলে কোন সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, যুদ্ধ বিরতি সাময়িক সমাধান হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজনৈতিক চুক্তিতে উপনীত হতে হবে। সোভিয়েত প্রতিনিধি চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেন যে, 'সাময়িক স্বার্থে' দেশ দুটি মৌল সমস্যাকে উপেক্ষা করছে।[১৩] সোভিয়েত প্রতিনিধির বক্তব্যের পর পরিষদের সভাপতি সোভিয়েত প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এতে ফলাফল হলো ঃ

পক্ষে	ঃ	সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ড
বিপক্ষে	ঃ	চীন
ভোটদানে বিরত	ঃ	আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিয়ন, সোমালিয়া, সিরিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

চীনা ভেটোর কারণে এই খসড়া প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয় যারা ভোটদানে বিরত ছিল তারাও বক্তৃতাদানকালে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।

পরিষদের সভাপতি চীনা প্রস্তাবের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে ভোট গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে চীনা প্রতিনিধি জানান যে, তারা এখনও পরিষদের সদস্যদের সাথে 'পরামর্শ' করছে। ফলে চীন ভোট গ্রহণের বিরোধিতা করে। আবার আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে নিরাপত্তা পরিষদের ৮টি সদস্য রাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হয়। এতে ফলাফল দাঁড়ায় ঃ

পক্ষে	ঃ	আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্ডি, চীন, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন সোমালিয়া, সিরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।
বিপক্ষে	ঃ	পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।
ভোটদানে বিরত	ঃ	ফ্রান্স ও ব্রিটেন।[১৫]

সোভিয়েত ভেটোর কারণে এই প্রস্তাবটিও বাতিল হয়ে যায়। এই ভোট গ্রহণের পর ফরাসি প্রতিনিধি এ ধরনের প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবের ফলাফলকে 'পূর্ব অনুমানমূলক' (Completely Predictable) বলে মন্তব্য করেন।[১৬] তার এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। কারণ নিরাপত্তা পরিষদে বিতর্ক কালেই বিভিন্ন দেশের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল এবং স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বীয় অবস্থানে অনড় থাকায় পরিষদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ৩ দিনে ২০ ঘন্টারও বেশী সময় আলোচনা করার পর নিরাপত্তা পরিষদ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। সমস্যাটি সমাধানে তখনও পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সাফল্য শূন্য ছাড়া কিছু ছিল না। বিশেষ করে দুই পরাশক্তির বিপরীতধর্মী অবস্থানের কারণে জাতিসংঘের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গসংস্থা নিরাপত্তা পরিষদে অতীতের মত এবারও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। উপোরোক্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬তম ও ১৬০৭তম বৈঠকে দুটো প্রধান চিন্তাধারা সক্রিয় ছিল। প্রথমটি হলো যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিতীয়টি হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি। উপমহাদেশের পরিস্থিতি তথা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম প্রশ্নে মার্কিন মূল্যায়ন বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ফলে মার্কিন নীতিতে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পায় এবং তা পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক নীতিতে পর্যবসিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসন চালানোর কথা বললেও কিন্তু কেন এই আগ্রাসন তার উত্তর অনুসন্ধান যেমন করা হয়নি, তেমনি ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান যে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সেই সঠিক তথ্যটিও চেপে যাওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বাস্তববাদী ভূমিকা গ্রহণ করে। সোভিয়েত প্রতিনিধি বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক সমাধান এবং যুদ্ধ বিরতি এই প্রশ্ন দুটোকে অবিচ্ছিন্ন হিসেবে বিবেচনা করে বলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের উচিত দুটো লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজ করে যাওয়া। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, সোভিয়েত অবস্থানই সঠিক। নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকসমূহে যখন অচলাবস্থা বিরাজ করছিল, তখন পশ্চিম গোলার্ধ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে রণাঙ্গনে মুক্তি ও মিত্র বাহিনির যৌথ সেনাদলের সাথে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সর্বাত্মক যুদ্ধ চলছিল। একই সময় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি গুণগত পরিবর্তন হয়। ৬ ডিসেম্বর প্রধাণমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে বাংলাদেশেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণা দেন।[১৭]

ভারতের স্বীকৃতি প্রদানের পর জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেন উপমহাদেশের এই নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আইনগত, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যুক্তিসঙ্গতভাবেই সমর সেন বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের প্রতিনিধির কথা বিবেচনা না করে (এখানে তার বক্তব্য না শুনে) কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ভ্রান্ত, অযৌক্তিক, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এমনকি তা বিপর্যয়ও ডেকে আনতে পারে। সমর সেন সংকটের উৎস খুঁজে বের করার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদকে আহবান জানান। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "We shall not, we cann't and we must not accept any resolution or decision which does not go the root cause of the matter[১৮]

শান্তির জন্যে ঐক্য ফর্মুলা

নিরাপত্তা পরিষদে এই অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিষদের ১১টি সমমনা রাষ্ট্র সমস্যাটিকে সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করা যায় কী-না সে সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করে। এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল সাধারণ পরিষদের ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বরের প্রস্তাব ৩৭৭ (V) অনুয়ায়ী। এটি সাধারণত শান্তির জন্যে ঐক্য ফর্মুলা বা 'Unity for Peac Exercise' নামে পরিচিত। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থার কারণে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে সাধারণ পরিষদ এই ফর্মুলার আওতায় কিছু সুপারিশ ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ১৯৫০ সালের প্রস্তাবে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যে সাধারণ পরিষদ সমষ্টিগত উদ্যোগ (Collective Measures) গ্রহণ করতে পারে। এমনকি আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে জাতিসংঘ তার সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করতে পারে।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশে যুদ্ধ বিরতি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে বিষয়টি সাধারণ পরিষদের হাতে ছেড়ে দেয়ার চিন্তা ক্রমশ প্রবল হয়। কয়েকটি দেশ অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় এ ধরনের চিন্তা করলেও নিকারাগুয়ার প্রতিনিধি সেভিল্লা সাকাসা (Sevilla-Sucasa) সর্বপ্রথম এই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, "যদি আমরা কোন কিছুই করতে ব্যর্থ হই, তবে সাধারণ পরিষদ উদ্যোগ নিতে পারে। কারণ এটা মনে করলেই চলবে না যে, কেবলমাত্র নিরাপত্তা পরিষদই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রশ্নে উদ্বিগ্ন থাকবে।"[২০]

এ চিন্তা থেকেই দেখা যায় নিরাপত্তা পরিষদের ৬টি দেশ যথাক্রমে আর্জেন্টিনা, বুরুণ্ডি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন ও সোমালিয়া পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব উথাপন করে (প্রস্তাব নং S/10429)। এ খসড়া প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয় যে, "নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬তম ও ১৬০৭তম বৈঠকে স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্য না হওয়ায় বিষয়টিকে (S/Agenda/ 1606) ১৯৫০ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব [377 A (v)] অনুযায়ী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে প্রেরণ করা হোক।"[২১]

৬টি দেশের এই প্রস্তাব উথাপনের পর নিরাপত্তা পরিষদে একটি সংক্ষিপ্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উদ্যোক্তা দেশগুলো এই বিতর্কের পরও তাদের প্রস্তাবে কোন পরিবর্তন আনেননি। নিরাপত্তা পরিষদের সকলেই জানতো যে, এ উদ্যোগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রস্তাবটির উপর বিতর্কের সময় তিনটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং অস্থায়ী সদস্য পোলাণ্ড ভিন্নমত পোষণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি বিষয়বস্তু (Substance) এবং প্রণালীগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রস্তাবকে ভ্রান্ত পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে তার যুক্তি হলো যে, সাধারণ পরিষদ শুধু সুপারিশ করতে পারে।[২২]

খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে ফরাসি প্রতিনিধির মনোভাব ছিল অনেকটা সোভিয়েত মনোভাবের সম্পূরক। ফরাসি প্রতিনিধির ভাষ্য হলো যে, এতে নতুন করে বিলম্ব (New Delays) এবং বাদানুবাদ (Polimics) হবে। সাধারণ পরিষদেরও তেমন ক্ষমতা নেই, যে কারণে ফ্রান্স ঐ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করছে না।[২৩] ব্রিটেনের প্রতিনিধি বলেন যে, সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ যে সীমাবদ্ধতায় আটকা পড়েছে, সাধারণ পরিষদও তা অতিক্রম করতে পারবে না।[২৪]

পরিষদের সভাপতি এই খসড়া প্রস্তাবের উপর বিতর্কের পর প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট দান করেন। ফলাফল দাঁড়ায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে	ঃ	আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুণ্ডি, চীন, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, সিরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।
বিপক্ষে	ঃ	শূন্য
ভোটদানে বিরত	ঃ	ফ্রান্স, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ড।

এ প্রস্তাব পাসের পর জাতিসংঘ উপমহাদেশে যুদ্ধ বন্ধে শান্তির জন্যে ঐক্য ফর্মুলা প্রয়োগের জন্য কার্যক্রম শুরু করে।

সাধারণ পরিষদের ২৬তম (বিশেষ) অধিবেশন

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম (বিশেষ) অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে ১৩টি সদস্য রাষ্ট্র আলোচনার জন্যে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবের চারটি বক্তব্য ছিল।

ক. অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্যে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি আহবান এবং উভয় দেশের সেনাবাহিনীকে নিজ নিজ সীমান্তে ফিরিয়ে আনা হোক;

খ. শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রচেষ্টা জোরদার করা হোক;

গ. মহাসচিবের সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব কার্যকর করার জন্যে আহবান জানাবেন।

ঘ. বর্তমান প্রস্তাবের আলোকে যথাবিহীত ব্যবস্থা নিতে নিরাপত্তা পরিষদের আহবান।[২৫]

এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার পর উপরিউক্ত ১৩টি দেশসহ মোট ৩৪টি দেশ একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার পর উপরিউক্ত ১৩টি দেশসহ মোট ৩৪টি দেশ একটি সংশোধিত খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ প্রস্তাবে ভারত-পাকিস্তানের প্রতি যুদ্ধ বিরতির আহবান জানানো, নিজ নিজ ভূখণ্ডে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনার আহবানের পাশাপাশি একটি নতুন বিষয় যুক্ত হয়। এতে সংঘর্ষপূর্ণ এলাকাতে বেসামরিক জনগণের জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানের আহবান জানানো হয়।[২৬]

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বলয়ের দেশগুলো এই দুটো প্রস্তাবকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রভাবিত প্রস্তাব হিসেবে আখ্যায়িত করে। স্নায়ু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তাই বিকল্প রুশ প্রস্তাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। তবে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রুশ প্রস্তাবে বাংলাদেশ সংকটের মৌল প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং তা সমাধানের বিষয়টি অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রস্তাবটি হল ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে যুদ্ধ বিরতির আহবান

খ. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচনী রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সেখানে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান।[২৭]

তিনটি খসড়া প্রস্তাবের উপর ১৩১ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদের ৫৮টি রাষ্ট্র ১২ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর পরিচয় দেশওয়ারী সারণি ৬.১ -এ তে প্রদান করা হলোঃ

সারণি - ৬ .১

এশিয়া	আফ্রিকা	ইউরোপ	মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা	অন্যান্য
ভুটান	আলজেরিয়া	আলবেনিয়া	আর্জেন্টিনা	অষ্ট্রেলিয়া
শ্রীলংকা	বুরুণ্ডি	বুলগেরিয়া	ব্রাজিল	ফিজি
চীন	শাদ	চেকোশ্লাভাকিয়া	চিলি	নিউজিল্যান্ড
সাইপ্রাস	গ্যাবন	ডেনমার্ক	ইকুয়েডর	যুক্তরাষ্ট্র
ভারত	ঘানা	ফ্রান্স	মেক্সিকো	
ইন্দোনেশিয়া	আইভোরি কোস্ট	গ্রীস	নিকারাগুয়া	
ইরান	মাদাগাস্কার	ইতালি	পেরু	
জাপান	মৌরিতানিয়া	নেদারল্যান্ড	উরুগুয়ে	
লেবানন	সিয়েরালিওন	পোল্যাণ্ড		
মালেশিয়া	সোমালিয়া	পর্তুগাল		
মঙ্গোলিয়া	সুদান	সোভিয়েত ইউনিয়ন		
নেপাল	তাঞ্জানিয়া	সুইডেন		
পাকিস্তান	টগো	ব্রিটেন		
সৌদি আরব	তিউনেশিয়া	যুগোশ্লাভিয়া		
তুরস্ক		হাঙ্গেরি		
ইমেন				
কুয়েত				
১৭টি দেশ	১৪ টি দেশ	১৫টি দেশ	৮টি দেশ	৪টি দেশ

সূত্র ঃ জাতিসংঘের বিভিন্ন দলিলপত্র পর্যালোচনা করে তৈরী করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ পরিষদে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মতামত

নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যের সকলেই সাধারণ পরিষদের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, তাদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এবং বিপরীতধর্মী অবস্থান নিরাপত্তা পরিষদে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল এখানেও তা প্রতিফলিত হয়। এখানে বৃহৎ শক্তিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোকে প্রভাবিত করেছিল। পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও বৃহৎশক্তি চীন নেপথ্যে ও প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষে জোরালো কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটা পরিষ্কার যে, ৩৪টি দেশের প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের পোষকতা ছিল। জর্জ বুশের বক্তব্য তার প্রমাণ। তিনি ঐ প্রস্তাবের উপর আলোচনার সময় বলেন,

> India bears the major responsibility for boardening the crisis by spurning the efforts of the United Nations to become involved, even in humanitarian way, in relation to the refugees, spurning proposals such as the one of our Secretary Generals offer at good office which could have helped in defusing the crisis spurning proposal that could have began the process of dialouge towards a political accomodation.[২৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন প্রতিনিধি বিভিন্ন সময় ভারত কর্তৃক জাতিসংঘের কিছু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের উল্লেখ করে ভারতকে এককভাবে দায়ী করেছেন। তবে বাস্তবে ভারত এককভাবে দায়ী ছিল না। কারণ রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ইয়াহিয়া দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন।[২৯]

যুক্তরাষ্ট্র যেখানে কৌশলে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল সেখানে চীন নিরাপত্তা পরিষদের ন্যায় সাধারণ পরিষদেও সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়। চীনা প্রতিনিধি মিঃ চিয়াও (Mr. Chiao) বলেন যে, তিব্বতের শরণার্থীদের মত বাঙালি শরণার্থীদের নিয়ে ভারত ষড়যন্ত্র করছে। তিনি ভারতকে "প্রত্যক্ষ আগ্রাসী" (Outright aggressor) হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে চায়। চীনা প্রতিনিধি অভিযোগ করেন যে, "ভারতীয় আগ্রাসনের পেছনে সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে প্রধান মদদদাতা" (The boss behind the Indian agresson) চীন অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা এবং নিজ নিজ সীমান্তে দু'দেশের সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়।[৩০]

সোভিয়েত প্রতিনিধি প্রস্তাবটির উদ্যোক্তাদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, উদ্যোক্তা ও উৎসাহীগণ যারা এ প্রশ্নটিকে সাধারণ পরিষদে স্থানান্তর করছে ..তারা একই সমগোত্রীয় যারা ভারতীয় উপমহাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের চোখ বন্ধ করে রেখেছে। পরিস্থিতির সত্যিকার মূল্যায়ন না করে এরা সংঘাতের প্রধান কারণগুলো আড়াল করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে।[৩১]

তিনি এ উদ্যোগকে চীন-মার্কিন আঁতাত (duet) বলেও অভিহিত করেন। তিনি পুনরায় বলেন যে দুটো উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, প্রথমত যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার আহবান এবং দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলার জনগণের অধিকার ও স্বার্থের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক সমাধানই কেবল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সোভিয়েত প্রতিনিধির মতে এর ফলে কেবল যুদ্ধ বিরতিই অর্জিত হবে তাই নয় একই সাথে গোটা অঞ্চলে রক্তপাত বন্ধ হবে, শান্তিপ্রিয় জনগণ মৃত্যু ও নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর নেমে আসা অবর্ণনীয় নির্যাতনের অবসান হবে। চীনের অভিযোগ প্রসঙ্গে সোভিয়েত প্রতিনিধি বলেন চীন জাতিসংঘের মত একটি ফোরামকে সোভিয়েত বিরোধী প্রচারনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।[৩২] সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' আখ্যায়িত করার জবাবে রুশ প্রতিনিধি বলেন, "Day after day they repeat the term 'social imprialism'. But gentlemen, 'social imperialism' is as great an absurdity as fried ice."[৩৩]

সাধারণ পরিষদের খসড়া প্রস্তাবসমূহের উপর আলোচনাকালে দুটো বৃহৎ শক্তি ফ্রান্স ও ব্রিটেন গোটা পরিস্থিতির উপর একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের প্রয়াস পায়। বিশেষ করে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মত তারা একদেশদর্শী ও পক্ষপাতমূলক কোন বক্তব্য প্রদান করেনি। ফরাসি প্রতিনিধির বক্তব্য ছিল বাস্তবধর্মী এবং উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি চমৎকার বিশ্লেষণমূলক বিবরণ দিয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি বলেছিলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে পরিষদ যেমন কোন উদ্যোগ নিতে পারেনি, তেমনি সাধারণ পরিষদের অবস্থাও একই।[৩৪] এ প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত দুটো খসড়া প্রস্তাবের উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, সাধারণ পরিষদের বিতর্ক থেকে কোন সমাধান বেরিয়ে আসবে না । ফরাসি প্রতিনিধি জিজ্ঞাসার সুরে বলেন "যদি সাধারণ পরিষদের বিভক্তি নিশ্চিত হয়ে যায় তবে আমরা কেন আশা করি যে, নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদের আহবানে সাড়া দেবে ? এবং সর্বোপরি আমরা কেন বিশ্বাস করবো যে এটা বৈরিতার অবসান ঘটাবে ?[৩৫] তিনি আরো বলেন প্রস্তাবসমূহ কেন ঘটনা প্রবাহের অগ্রগতিকে অবহেলা করবে ?[৩৬] ফরাসি প্রতিনিধি মূলত অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন উপমহাদেশে ঘটনাবলীর ত্বরিত পরিবর্তনের দিকে। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হওয়ার পর মাত্র কয়েকদিনে সেখানে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমত, মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের হাত থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা মুক্ত করায় স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। দ্বিতীয়ত, ভারত বাংলাদেশকে এ সময় স্বীকৃতি দিয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এ নতুন পরিবর্তনের বিষয়টি ফরাসি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্যদের অবহিত করেন। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধি তাদের পুরানো বক্তব্য ও ধ্যান ধারণা থেকে খুব একটা সরে এসেছিল এটা বলা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফরাসি প্রতিনিধি যুগপৎ বোধ ও চিন্তার সমন্বয়ে উপমহাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন।

সাধারণ পরিষদে বিতর্কে ব্রিটেন ফ্রান্সের অনুরূপ অবস্থান গ্রহণ করে। তবে ব্রিটেনের প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন "নিরাপত্তা পরিষদই হচ্ছে প্রধান ফোরাম," এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কেবল নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে নেয়া যায় বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।[৩৭]

উপমহাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহের মতামত

সাধারণ পরিষদের এ বিতর্কে উপমহাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। আফগানিস্তান ও বার্মা এ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেনি। শ্রীলংকার (সে সময় সীলন CEYLON) প্রতিনিধি তার দীর্ঘ বক্তব্যের প্রথমেই "কঠোরভাবে নিরপেক্ষে" থাকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন "সংঘাতের উৎস অনুসন্ধানের সময় এখন আর নেই.. আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করতে পারি না যে, যে কারণেই হোক পাকিস্তানের ভূ-খণ্ডের যতক্ষণ বিদেশী সৈন্য থাকে ততক্ষণ পাকিস্তান সরকার তার দেশের স্বীকৃত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসবে।" একই সময় শ্রীলংকার প্রতিনিধি পাকিস্তানের প্রতি আহবান জানান যে," অবিলম্বে পাকিস্তানের স্বীকৃত নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা শুরু করুন"[৩৮] আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে শ্রীলংকা একটি ভারসাম্যমূলক বক্তব্য রেখেছিল। কিন্তু সংকটটির প্রতি এ ধরনের মনোভাবকে তিনটি কারণে অবাস্তব হিসেবে অভিহিত করা যায়। প্রথমত, সংঘাতের মূল কারণকে অবহেলা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলায় বিদ্যমান সংঘাতকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, পূর্ববাংলার ঘটনা প্রবাহের (ডিসেম্বর প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে) ত্বরিত পরিবর্তন সম্পর্কে চোখ বন্ধ রাখা হয়েছে। এর কারণ অস্পষ্ট নয়। দেখা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘের বাইরেও শ্রীলংকা পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৭১ সালের সংকটময় দিনগুলোতে শ্রীলংকা পাকিস্তানকে ট্রানজিট সহায়তা প্রদানে এগিয়ে এসেছিল। এর পেছনে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে শ্রীলংকার নিরাপত্তার প্রশ্ন। নিরাপত্তাগত কারণে শ্রীলংকা মনে করেছিল যে, পাকিস্তানের পরাজয়ের মধ্যদিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তির ভারসম্য নষ্ট হবে। এবং পরিণামে তার নিরাপত্তার প্রশ্নটিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ শ্রীলংকা ভীত ছিল যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলে ভবিষ্যতে হয়তো শক্তিধর ভারত বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে শ্রীলংকার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ করে যেখানে ভারতের একটি

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যের তামিলদের সাথে শ্রীলংকার তামিলদের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। একই কারণে শ্রীলংকা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানেও বিলম্ব করেছিল।

নেপালের প্রতিনিধি পাকিস্তানের সম্ভাব্য বিভক্তিতে শ্রীলংকার মত এত উদ্বিগ্ন ছিল না। তিনি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা এবং সৈন্য প্রত্যাহারবিষয়ক প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। তবে তিনি বলেন যে, যুদ্ধ বন্ধ হলেই যে কারণে সংঘাতের সূচনা হয়েছে তার সমাধান হবে না।[৩৯] দক্ষিণ এশিয়ার অপর ক্ষুদ্র দেশ ভুটান ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।[৪০]

আরব বিশ্ব

আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাথে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ছিল। তথাপি ভারতের সাথেও বেশ কয়েকটি দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ফলে দু' একটি দেশ প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেনি। তদুপরি ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই ভারত এর বিরোধিতা করে আসছিল। কিন্তু জাতিসংঘ যখন সমর্থনের প্রশ্ন এলো তখন তারা 'ভ্রাতৃপ্রতিম' পাকিস্তানেরই পক্ষে অবস্থান নেয়। বিশেষ করে ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানের সাথে আরব বিশ্বের একটি ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক ছিল, এবং পাকিস্তানের মত একটি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের দু'ভাগে বিভক্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় তারা বিষণ্ন বোধ করছিল। এ ধরনের একটি অনুভূতি থাকা অসঙ্গতও নয়।[৪১] তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, ইসলাম ধর্মের নামে স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সবাই নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণ পরিষদে বিতর্কে আরব বিশ্বের মাত্র দুইটি দেশ অংশ নিয়েছিল। দেশ দুটো হলো জর্দান ও লেবানন। জর্দান ১৩টি দেশের উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানায়। জর্দানের প্রতিনিধি মন্তব্য করেন যে, সংকটের কারণ সমূহ খুঁজে বের করা "অপ্রাসঙ্গিক"। জর্দান ভারতের হস্তক্ষেপ কেও সমালোচনা করে। জর্দানীয় প্রতিনিধি তার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, বর্তমান সংকটের কারণ যাই হোক না কেন, একদেশের ভূ-খণ্ডে অন্যদেশের হস্তক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।[৪২]

লেবাননের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ছিল। ১৩টি দেশের উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে লেবাননের প্রতিনিধি বলেন, "আমার সরকারের মনোভাব হচ্ছে যে, আমরা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের নীতিকে শ্রদ্ধা করি অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করি এবং পাকিস্তানের শরণার্থী (ভারতে আশ্রয় নেয়া) সমস্যার একটি ন্যায়সঙ্গত মানবিক সমাধান আশা করি।"[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা রাষ্ট্র মিশরের সাথে ভারতের নেহরুর সময় থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মিশর কিছুটা ভারতের প্রতি দীর্ঘদিনের সুসম্পর্কের কারণে আবার অন্যদিকে মুসলিম দেশ হিসেবে পাকিস্তানের প্রতি সমকালীন প্রেক্ষাপটে দায়বদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ প্রশ্নে কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নি।

পূর্ব ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের মতামত

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের তিন প্রবক্তা দেশ হচ্ছে মিশর, যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের এই তিন প্রভাবশালী দেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রায় একই ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘে পূর্ববাংলা প্রশ্নে যখন বিতর্ক শুরু হয়, তখন মিশর তাতে অংশ নেয়নি। অন্যদিকে যুগোশ্লাভিয়া অংশগ্রহণ করেছিল। যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি পূর্ববাংলা সংকট সম্পর্কে একটি সমঝোতামূলক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্য সংকটের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং যথাসময়ে বিষয়টি সমাধানের ব্যর্থতার দায়িত্ব নেয়া উচিত। যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি ৩৪টি দেশের সংশোধিত খসড়া প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ও পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধির সাথে সমঝোতার মাধ্যমে এই সংকটের একটি ত্বরিত সমাধানের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হোক। তিনি খসড়া প্রস্তাবটি আরো সংশোধিত করার জন্যে দাবি জানান যাতে সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সকল বাধাসমূহ অপসারণ করা যায়।[৪৪]

পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত বলয়ের দেশ যেমন বুলগেরিয়া, চকোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড এবং এশিয়ার মঙ্গোলিয়া তাদের বিবৃতিতে দুটো প্রধান বিষয়ের ওপর জোর দেয়। (ক) সামরিক দিক থেকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা (খ) রাজনৈতিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান।[৪৫] দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, উরুগুয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সংঘাত প্রশ্নে অনেকটা একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো। তারা মোটামুটি সবাই ১৩টি দেশের খসড়া প্রস্তাব এবং ৩৪টি দেশের সংশোধিত খসড়া প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং উপমহাদেশে যখন সংঘর্ষ চলছিল তখন সবাই মনে করতো যে, জাতিসংঘের উচিত প্রথমেই সংঘাত বন্ধ করা। সংঘাতের মৌলিক কারণসমূহ সমাধানের জন্যে রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়টি হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। অর্থাৎ যুদ্ধ বিরতি কার্যকর এবং এক দেশ থেকে অন্যদেশের সৈন্য প্রত্যাহারের পরই জাতিসংঘ দ্বিতীয় পদক্ষেপটি নিতে পারে।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে চিলি ও পেরু স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছিল। চিলির প্রতিনিধি পূর্ববাংলা সংকটের বহুমুখী দিক বিশ্লেষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর বিবৃতিটির একাংশ হুবহু উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> It is necessary at this juncture to call for a positive measure whereby we would not only launch an appeal that would be merely formalistic in its overall apperance, but would adopt a type of draft resolution that would be based on the principles which we are all called upon to respect, principles that are interlinked among themselves and that would be valid both individually and in the interconnextion that exists between them : cease-fire, withdrawal of troops, protection of human rights, the adoption of immediate measures for the solution of the political problem in the area in question in order to ensure the return of the refugees, non-interference, free self determination, territorial integrity, the active persense of the United Nations-these and other principles stressed in the past as fundemental to international security.[৪৬]

চিলির প্রতিনিধি তার বক্তব্যে সমস্যা সমাধানের একটি চমৎকার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি ১৩টি দেশের উত্থাপিত প্রস্তাব (AL/647) এবং সোভিয়েত প্রস্তাব (AL/648) এর মধ্যে "সমঝোতার মাধ্যমে" একটি সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব করেন। পেরুর প্রতিনিধি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "To cope with the effects and ignore the causes is a half measure which will not take as very far.[৪৮] তদুপরি পেরুর প্রতিনিধি মন্তব্য করেছিলেন যে, সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাব (AL/647) একটি অসম্পূর্ণ প্রস্তাব। কারণ তার মতে কেবলমাত্র যুদ্ধ বিরতি এ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বিশেষ করে যে প্রশ্নটি উপমহাদেশে বৈরিতার সূচনা করেছে তা অবহেলা করা যৌক্তিক হবে না।

আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর মতামত

সাধারণ পরিষদে এ বিতর্কে অংশগ্রহণ আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশ আইনগত প্রশ্ন যেমন "হস্তক্ষেপ বিরোধী নীতিমালা" ইত্যাদির অবতারণা করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পক্ষে বিবৃতি প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে আলজেরিয়ার প্রতিনিধির বক্তব্য বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি বলেছিলেন যে, এ প্রস্তাবটির ভুল-ভ্রান্তি

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজে দেখা নয় বরং তার সুপারিশ হলো যে, জাতিসংঘ সনদে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত কাঠামো ও তৃতীয় বিশ্বের মৌলিক নীতিমালার যে কাঠামো অর্থাৎ অন্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ এর আলোকেই একটি সমাধানে পৌঁছানো উচিত। আলজেরিয়ার প্রতিনিধির এ বিবৃতির মাধ্যমে উপমহাদেশে সৃষ্ট সংকটের মূল উৎসটিকে আড়াল করে গোটা বিষয়টিকে ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৪৯] বুরুন্ডি,[৫০] শাদ,[৫১] আইভেরিকোস্ট,[৫২] সুদান,[৫৩] তাঞ্জানিয়া,[৫৪] টগো,[৫৫] এবং তিউনেসিয়া[৫৬] প্রভৃতি আফ্রিকীয় দেশগুলো পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর গুরুত্বারোপ করে। ঘানার প্রতিনিধি তার বিবৃতিতে হস্তক্ষেপ নীতিমালার বিপদজনক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেন। যদিও তার বক্তব্য আফ্রিকার প্রেক্ষাপটে সঠিক হলেও পূর্ববাংলা প্রশ্নে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তার বিবৃতির একটি অংশ হলো ঃ

> "The Organization of African Unity know that once intervention in the affairs of a member state is permitted, once one permits oneself the higher wisdom at telling another memeber state what should do with regard to arranging its own political affiars, one opens a pondora's box. And no continent can suffer more than Africa when such a principle is thawarted."[৫৭]

জাতীয় সংহতির জন্যে সংকটগ্রস্থ ঘানা আফ্রিকার অন্যান্য দেশের ন্যায় রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতির প্রশ্নে অনড় ছিল। বায়াফ্রার মত ঘটনার বিরূপ স্মৃতি তাদের মনে জাগরুক ছিল। তবে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং পূর্ববাংলা প্রশ্নে ঘানার প্রতিনিধির যুক্তি ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকীয় দেশের বিপরীতে অন্তত তিনটি দেশ পূর্ববাংলা প্রশ্নে সাহসের সাথে ভিন্নধর্মী বক্তব্য প্রদান করে। দেশ তিনটি হচ্ছে গ্যাবন, মাদাগাস্কার ও সিয়েরালিওন। মাদাগাস্কারের প্রতিনিধি অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার উপর গুরুত্ব দেন। তবে যে কোন মূল্যে এমনকি পূর্ববাংলার জনগণের স্বাধীনতার বিনিময়ে পাকিস্তানের জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সরাসরি বলেন, "এটা জরুরি ও প্রয়োজনীয় যে, সুষ্ঠুও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাভাবিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং এ উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষকরে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার নীতির প্রতি ছাড় দেয়া উচিত।... আমাদের দৃষ্টিতে ঐ নীতিটির (রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতি) কঠোর ব্যাখ্যা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলবে।"[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

গ্যাবনের প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত ১৩টি দেশের প্রস্তাব ও সোভিয়েত প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, "দুটো প্রস্তাবের বিষয়বস্তু (Text) একত্রিত করা হোক । আমার বিশ্বাস তাতে আমরা এমন একটি বিষয়বস্তু (Text) পাব যা ব্যাপক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করবে।"[৫৯] উল্লেখ্য, সিয়েরালিওনের প্রতিনিধি যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত ৩৪ টি দেশের খসড়া প্রস্তাবের (A/L647 Revl) এর অন্যতম উদ্যোক্তাও ছিলেন, তিনি দুটো প্রস্তাবের সমন্বয়ের পক্ষপাতি ছিলেন।[৬০]

ভারত ও পাকিস্তানের মতামত

পাকিস্তানে ও ভারতের প্রতিনিধিদের বক্তব্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা নিরাপত্তা পরিষদে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, সাধারণ পরিষদে তারই প্রতিধ্বনি করেন। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মিঃ আগাশাহী, 'তথা কথিত বাংলাদেশ' সৃষ্টির জন্য ভারতকে দোষারোপ করেন। দীর্ঘ কূটনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে আগাশাহী পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষে জাতিসংঘ তার 'যুদ্ধ' অব্যাহত রাখেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর 'বাংলাদেশ' চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে আগাশাহী সোমালিয়ার নেতৃত্বে উত্থাপিত ৩৪টি দেশের সংশোধিত প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। সোভিয়েত প্রস্তাব সম্পর্কে তার মন্তব্য ছিল "Suffering from a serious deficency."[৬১]

ভারতের প্রতিনিধি সমর সেন তার বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলেন, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ধারণায় প্রভাবিত হয়ে সাধারণ পরিষদে অধিকাংশ দেশ উপমহাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। তিনি বলেন যে, সেই পাকিস্তান এখন অতীতের বিষয় এবং নতুন বাস্তবতা হলো যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সমর সেন বলেন, "অগণিত বাঙালির শবদেহের পাহাড়ের নীচে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির কবর রচিত হয়েছে।" এ প্রসঙ্গে সমর সেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর বক্তব্যের একটি উদ্ধৃতিও দেন, যেখানে ভুট্টো বলেছিলেন যে, "পুরানো পাকিস্তান এখন মৃত"। সাধারণ পরিষদে বিতর্কের শেষ পর্যায়ে সমর সেন পুনরায় ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সোমালিয়ার নেতৃত্বে ১৩টি দেশের খসড়া প্রস্তাবের সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এর মাধ্যমে বিশ্বসংস্থাটির চিন্তাশীল মনোভাব (Sensitivity) প্রকাশ পেয়েছে। তবে সমর সেন বলেন যে, প্রস্তাবটি অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক এমনকি বিপজ্জনক।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

৩৪টি দেশের প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহন

সাধারণ পরিষদে শান্তির জন্যে ঐক্য ফর্মুলা অনুসারে মোট তিনটি প্রস্তাব, ক. ১৩টি দেশের প্রস্তাব (A/L 647), ৩৪ টি দেশের প্রস্তাব A/L 647 (Rev) এবং সোভিয়েত প্রস্তাব A/L 648 সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর সাধারণ পরিষদের সভাপতি কার্যপ্রণালীর ৯৩ ধারা অনুযায়ী ভোট গ্রহণের উদ্যোগ নেন। তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে আর্জেন্টিনার নেতৃত্বাধীন ৩৪টি দেশের সংশোধিত প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটের ফলাফল হলো ঃ

পক্ষে ঃ ১০৪টি দেশ

বিপক্ষে ঃ ১১টি দেশ

বিরত ঃ ১৬টি দেশ[৬৩]

দেখা যাচ্ছে যে, প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়েছে। তবে গৃহীত প্রস্তাবটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কোন সুখকর বা সঙ্গতিপূর্ণ প্রস্তাব ছিল না। কারণ এখানে বাঙালিদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে কার্যত অস্বীকার করা হয় এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতির সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। সাধারণ পরিষদে ভোট গণনার ফলাফল যখন নিউইয়র্কের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে দেখানো হচ্ছিল, তখন কাকতালীয়ভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) প্রতিনিধি রেহমান সোবহান ঐ টেলিভিশন চ্যানেলে বাংলাদেশ প্রশ্নে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে কোন সমর্থন পাওয়া গেল না। সে সম্পর্কে তাঁর (রেহমান সোবহান) জবাব কী ? রেহমান সোবহান তাৎক্ষণিকভাবে বলেছিলেন ঃ

> পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে যে, গণহত্যা চালাচ্ছে সেই বাংলাদেশ যুদ্ধের মূলে থাকলেও বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্যে বাংলাদেশকে সাধারণ (পরিষদ) অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কাজেই বাংলাদেশের জনগণ যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানি আগ্রাসনকে পরাজিত না করছে, ততদিন পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব।[৬৪]

রেহমান সোবহানের যুক্তি হলো যে, বাংলাদেশকে একটি পক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ায় পাকিস্তান এবং তার প্রভাবশালী মিত্ররা সাধারণ পরিষদের অধিকাংশ দেশকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে।

ভোটদানের নমুনার একটি বিশ্লেষণ

আবর দেশগুলোর মধ্যে ওমান ব্যতীত সবাই প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদান করে। ওমান ভোটদানে বিরত থাকে। আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে সেনেগাল ও মালাউই ভোটদানে বিরত থাকে এবং বাকী সবাই প্রস্তাবের পক্ষে সম্মতি জানায়। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে মাত্র দুটো দেশ চীন ও যুক্তরাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপক্ষে এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেন বিরত থাকে। পশ্চিম ইউরোপের ডেনমার্ক ভোটদানে বিরত থাকে। যুগোশ্লাভিয়া সাধারণ পরিষদে বিতর্ককালে গণহত্যার নিন্দা করলেও শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট প্রদান করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা প্রস্তাবের পক্ষে এবং ভুটান প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট প্রদান করে। আফগানিস্তান ও নেপাল ভোটদানে বিরত থাকে। পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র সিঙ্গাপুর এ কাজটি করে।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র কিউবা সোভিয়েত ইউনিয়নের পদাঙ্ক অনুসরন করে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় এবং চিলি ভোট দানে বিরত থাকে। পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত প্রভাবিত দেশসমূহ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় এবং একমাত্র রোমানিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদান করে।

প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

জাতিসংঘ মহাসচিব ৭ ডিসেম্বর এক টেলিগ্রাম বার্তায় সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে অবহিত করেন। ৯ ডিসেম্বর পাকিস্তান এই প্রস্তাবের একাংশ গ্রহণ করে জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর বার্তা প্রেরণ করে। পাকিস্তান অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি মেনে নিলেও, ১ কোটি শরণার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে নীরব থাকে।[৬৫] অন্যদিকে ভারত প্রস্তাবটি সম্পর্কে নীরবতা পালন করে। দেখা যায় যে, ভারত ১২ ডিসেম্বর মহাসচিব বরাবর প্রেরিত এক বার্তায় যদিও জাতিসংঘের সাথে সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু উপমহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য এবং সংঘর্ষের মূল কারণসমূহ অনুসন্ধান করায় জাতিসংঘকে অনুরোধ জানায়। অর্থাৎ ভারত প্রস্তাবটির সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।[৬৬]

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১১তম বৈঠক

সাধারণ পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব গৃহীত হলেও যুদ্ধ বন্ধ হয় নি। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ঢাকার প্রবেশ দ্বারে চলে আসে । এ অবস্থায় উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা চলতে থাকে এবং নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্যে বৃহৎ শক্তি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১২ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি অবিলম্বে পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের আহবান জানান। ফলে ঐদিন বিকেল চার ঘটিকায় পরিষদের ১৬১১তম বৈঠক বসে।

সাধারণ পরিষদের শান্তির জন্যে ঐক্য প্রস্তাবের পক্ষে বিপুল সংখ্যক দেশ ভোট প্রদান করায় ভারত কিছুটা বিব্রত হয়। ফলে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরন সিং -এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘে প্রেরণ করে। অন্যদিকে পাকিস্তানও কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করে এবং নবনিযুক্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব ও বিভিন্ন দেশের বিতর্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ বৈঠক শুরু হলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে তিনি মূলত ভারতের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের আমন্ত্রণ জানান।[৬৭] তিনি ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তীব্র সমালোচনা করেন। জর্জ বুশের ভাষ্য হলো যে,

> Did India intend to use the present situation to destroy the Pakistan army in the west? Did India intend to use the counter attacks in the west as a pretext to annex territory in the West Pakestan? Was is aim to take parts of Pakistan controlled Kashmir, contrary to the Security Council resolutions of 1948, 1949 and 1950 ?[৬৮]

জর্জ বুশ শুধু পূর্বাঞ্চলে ভারতকে আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেন নি তিনি পশ্চিমাঞ্চলেও বিশেষ করে ভারত পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মির দখল করে নিতে পারে এই অভিযোগও করেন। তবে তিনি বলেন, যদি ভারতের উদ্দেশ্য তা না হয়, তবে ভারতের উচিত জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহের প্রতি ত্বরিত প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করা।[৬৯]

পাকিস্তানের প্রতিনিধি জুলফিকার আলি ভুট্টো দীর্ঘ বক্তৃতায় অতীতে ভারতের আগ্রাসন থেকে পাকিস্তানকে রক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে কাশ্মির প্রশ্নে জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয়েছে কিন্তু জাতিসংঘ কিছুই করতে পারেনি। কারণ ভারতের তুলনায় পাকিস্তান একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র।[৭০] তবে তিনি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে, পাকিস্তান মারাত্মক ভুল করেছে। তবে তার মানে এই নয় যে, একটি প্রতিবেশী দেশ বিচার করবে, পাকিস্তানের কোন প্রদেশ স্বায়ত্তশাসন পাবে অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।[৭১]

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৩তম বৈঠক

১৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৩তম বৈঠক শুরু হয়। ঐ বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি সর্দার শারদ সিং তার বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দেন। তিনি সংকটের একটি বিস্তৃত পটভূমি বর্ণনা করে বলেন যে, বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতা হিসাবে বিরাজ করছে। তিনি বলেন যে, যদি নিরাপত্তা পরিষদের কোন প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা না হয়, তবে এসব প্রস্তাব

Dhaka University Institutional Repository

শূণ্যগর্ভই থেকে যাবে। কারণ বাংলাদেশ সরকার তার দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং নিজস্ব ভূখণ্ডের উপর এই সরকারের কার্যকর কর্তৃত্ব রয়েছে।[৭২]

আলোচনা ও বিরতির পর যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণের আহবান জানায়। এ পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের অনুরোধে কিছু সংশোধনী মেনে নেয়।[৭৩] সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক সংশোধিত খসড়া মার্কিন প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন যে, মার্কিন প্রস্তাবে রাজনৈতিক সমাধানের কোন উল্লেখ নেই। তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন সবসময়ই একথা জোর দিয়ে বলে এসেছে যে, যুদ্ধ বিরতি, সৈন্য প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক সমাধান এই তিনটি বিষয় একই সঙ্গে হতে হবে।[৭৪] তিনি অভিযোগ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদকে অবাস্তব ও ভ্রান্ত পথে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র বলছে যে, শরণার্থীরা স্বেচ্ছায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার কোন গ্যারান্টির কথা দেশটি বলছে না।[৭৫] তিনি ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করে বলেন যে, ভারত কখনই যুদ্ধ চায় নি বরং পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত বিয়োগান্তক ঘটনাবলীর জন্যে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।[৭৬]

এই প্রস্তাবটি ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে ভোট গ্রহণ করা হলে তৃতীয় সোভিয়েত ভেটোর কারণে তা বাতিল হয়ে যায়।[৭৭]

নিরাপত্তা পরিষদে অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ

১৩ ডিসেম্বর পরিষদের অধিবেশনে ইতালি ও জাপান যৌথভাবে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। ঐ প্রস্তাবে মোট নয়টি পয়েন্ট ছিল। মূল দুটো বক্তব্য হলো (ক) জাতিসংঘ সনদের আওতায় এই সংকট মোকাবিলা করা প্রয়োজন। (খ) সংকটের একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন।[৭৮] ইতালি ও জাপানের প্রস্তাব সম্পর্কে যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদে কোন ঐকমত্য সৃষ্টি হয়নি, সেহেতু পরিষদের বৈঠক সেদিন স্থগিত হয়ে যায়।

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৪তম বৈঠক

১৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৪তম বৈঠকে আরম্ভ হয়। কিন্তু তখনও কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ব্রিটেন পরিষদের অন্যান্য সদস্য বিশেষত ফ্রান্সের সাথে একটি নতুন প্রস্তাব প্রণয়নের জন্যে পরামর্শ করতে থাকে যাতে তাদের প্রস্তাবটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। পোল্যাণ্ডও একটি প্রস্তাব প্রণয়নের কাজে ব্যস্ত ছিল। এ অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বিভিন্ন প্রণালীগত আলোচনা হয়। এরপর ব্রিটেন ও পোল্যাণ্ড তাদের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা এবং নিজ নিজ সরকারের নির্দেশের জন্যে বৈঠক

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী দিন পর্যন্ত মুলতবি করার আবেদন জানায়। চীনের মৃদু আপত্তি ব্যতীত পরিষদের সবাই এতে একমত পোষণ করে।[৭৯]

১৫ ডিসেম্বর পরিষদের বৈঠক পুণরায় শুরু হয়। ঐ বৈঠকে মোট চারটি খসড়া প্রস্তাব বিলি করা হয়। এগুলো হল পোলাণ্ডের প্রস্তাব (UN Doc S/10453/Rev-1), ব্রিটেনের প্রস্তাব (UN Doc S/10455), সিরিয়ার (UN Doc S/10456) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের (UN Doc S/10457) উত্থাপিত প্রস্তাব। এবং এসব প্রস্তাবের উপর আলোচনা শুরুর আগে পরিষদের সভাপতি পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে জরুরি বিবৃতিদানের জন্য আহ্বান জানান। তিনি একটি আবেগময় ও উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ অহেতুক কালক্ষেপণ করছে এবং গত চারদিন ধরে পরিষদ কার্যত কিছুই করছে না। কারণ তারা ঢাকার পতনের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার এই বক্তৃতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঢাকার পতন আসন্ন হয়ে ওঠেছে। ফলে ভুট্টো পরিষদের সদস্যদেরও অভিযুক্ত করেন। তিনি সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যর্থতার সৌধ নির্মাণের জন্যে আহবান জানান। ভুট্টো বলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদে এটাই তার শেষ বক্তৃতা। এরপর তিনি পোল্যাণ্ডসহ চারটি দেশের খসড়া প্রস্তাবের কপিসমূহ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেন।[৮০]

ভুট্টোর প্রস্থানের পর আমন্ত্রিত দেশ তিউনেসিয়াকে বক্তৃতাদানের আহ্বান জানান পরিষদের সভাপতি।[৮১] তিউনেশিয়ার প্রতিনিধি পাকিস্তানের পক্ষে সর্বশেষ সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি বলেন যে,

> Now what are we waiting for ? For all of East Pakistan to be occupied? For Bangla Desh to be proclaimed a new and independent state ? For a member state of the United Nations to be dismembered ? And for the Charter to be completely violated ?.. I doubout whether the members of the United Nations, great and small, wish to create precedents which will have very serious consequences.[৮২]

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৫তম বৈঠক

১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঃ ২০ ঘটিকায় নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৫তম বৈঠক বসে। এ বৈঠকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ব্যতীত ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধি এবং সভাপতির আমন্ত্রিত হিসেবে শ্রীলংকার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই চীনের প্রতিনিধি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি পাকিস্তানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের উচিত পাকিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব জাতীয় ঐক্য ও

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তিনি বলেন যে, "The Chinese delegation declares that, should any draft resolution contain provisions which interfere in the internal affairs of Pakistan, disrupt national Unity of Pakistan and support the pupet regime, the socalled "Bangla Desh", China will have no part it.[৮৩]

অর্থাৎ চীন নিরাপত্তা পরিষদে অন্তিম মুহূর্তেও বাংলাদেশের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারে নি । চীনা প্রতিনিধি বাংলাদেশকে 'তথাকথিত' এবং বাংলাদেশ সরকারকে 'পুতুল সরকার' বলে অভিহিত করেন। তিনি পোল্যাণ্ডের উত্থাপিত প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিক ও আইনসঙ্গতভাবে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার লক্ষ্যে আনীত প্রস্তাব বলে অভিহিত করেন।[৮৪] চীনা প্রতিনিধির বক্তৃতার পর পরিষদের সভাপতি উপমহাদেশের অন্য আরেকটি ক্ষুদ্র দেশ শ্রীলংকার প্রতিনিধিকে (আমন্ত্রিত) বক্তৃতাদানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, শ্রীলংকা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সমস্যার সমাধান কামনা করে। তাঁর মতে, এই সমাধান এরূপ হওয়া চাই যেখানে বিজয় হবে ঝামেলামুক্ত, পরাজয় হবে গ্লানিবিহীন এবং সর্বোপরি শান্তি বিরাজ করবে।[৮৫]

সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক পোল্যান্ডের প্রস্তাবকে বাস্তবপোযোগী বলে অভিহিত করে সমর্থন জানান।[৮৬] সিরিয়ার খসড়া প্রস্তাবে প্রথমবারের মত বলা হয় যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ম্যান্ডেট কার্যকর করতে সক্ষম হয়।[৮৭]

সিরিয়ার খসড়া প্রস্তাবের অনুরূপ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স পারস্পারিক আলোচনার পর একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাব উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ বিরতির বিষয়টিকে পৃথকভাবে দেখা হয়। ঐ প্রস্তাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বলা হয়।[৮৮] সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব অনেকটা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রস্তাবের অনুরূপ ছিল। তার ঐ প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছতে হবে। একই সাথে যুদ্ধ বিরতির ঘোষণাও দিতে হবে।[৮৯]

এসব খসড়া প্রস্তাব উত্থাপনের পর বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র কেউই ভোট গ্রহণের জন্যে উৎসাহ দেখায়নি। বরং তারা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা অব্যাহত রাখে। এজন্যে ১৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত পরিষদের বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করা হয়।[৯০]

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৬তম বৈঠক ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৬তম বৈঠক ১৬ ডিসেম্বর দুপুর ১২ ঃ ০৫ মিনিটে বসে। এতে পরিষদের সদস্য ব্যতীত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরন সিং, সৌদি প্রতিনিধি মিঃ জামিল বারুদি, তিউনেসিয়ার প্রতিনিধি ও শ্রীলংকার প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতির আমন্ত্রিত হিসেবে আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি ঘোষণা করেন যে, পরিষদের সামনে ইতালি ও জাপানের, (S/10451), পোল্যাণ্ডের (S/10453/Rev-1), সিরিয়ার S/10456), ফ্রান্স ও ব্রিটেনের (S/10455), সোভিয়েত ইউনিয়নের (S/10457), এই মোট পাঁচটি খসড়া প্রস্তাবের ভাগ্য নির্ধারণের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া সভাপতি বলেন যে, চীনের ইতোপূর্বে উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাব (S/10421), এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের (S/10428),খসড়া প্রস্তাবকেও ভোটে দেয়া হয় নি।[৯১]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

সভাপতির প্রাথমিক বক্তব্য শেষ হবার পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি বিবৃতি পড়ে শোনান। এতে দুটো মূল বক্তব্য ছিল ক. ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় খ. পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা।[৯২]

যুদ্ধ বিরতি প্রশ্নে সর্বশেষ বিতর্ক ও নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভারতের একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পরও নিরাপত্তা পরিষদে একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিতর্ক অব্যহত থাকে। শেষাবধি ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের ৬টি অস্থায়ী সদস্য দেশের উত্থাপিত প্রস্তাবটি পাস হয়ে যায়। ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ১৩টি দেশ ভোট দেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ড ভোটদানে বিরত থাকে। ঐ প্রস্তাবের দুটি মৌল বক্তব্য ছিল। ক. যুদ্ধ বিরতি পালন করার আহবান, খ. সংশ্লিষ্ঠ সকল পক্ষকে জেনেভা কনভেনশন মেনে চলার আহবান।[৯৩] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ এই প্রথম বাংলাদেশকে একটি পক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইতোপূর্বে যেখানে বলা হত, ভারত পাকিস্তান, এখন বলা হচ্ছে সংশ্লিষ্ঠ সকল পক্ষ। পরবর্তী দিন ২২ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের ঘটনাবহুল ২৬তম অধিবেশনেরও সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন

উপরের আলোচনায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদে পরাশক্তি, বৃহৎশক্তি এবং উন্নয়ণশীল বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, বৃহৎ-ক্ষুদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র মূলত তাদের ভূ-রাজনীতি ও জাতীয় স্বার্থ অনুয়ায়ী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে জাতিসংঘে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের ভূমিকা একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

এক.

দুই পরাশক্তির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতি বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করেন। ডিসেম্বরে যখন উপমহাদেশের পরিস্থিতি একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তখন নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি ভূ-রাজনতিক স্বার্থে তৎপর হয়ে উঠেন। তাদের এই নীতিকে ঝুঁকেপড়া নীতি (Tilt Policy) নামে অভিহিত করা হয়। যদিও এই নীতির সূচনা হয়েছিল কিসিঞ্জারের চীন সফরের অব্যহতি পর, তবে এই নীতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপের (WSAG) ৩, ৫, ৬ ও ৮ ডিসেম্বরের সভাগুলোতে। এ ধরনের একটি সভায় কিসিঞ্জার স্পষ্ট করে বলেন, "The President does not believe we are carring out his wishes. He wants to tilt in favor of Pakistan".[৯৪] ফলে যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এবং জাতিসংঘে তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। কিসিঞ্জার ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশান গ্রুপের বৈঠকে বলেন, "We want a resolution which will be introduced with a speech by Ambassador Bush. If others desire to come along with us, fine; but in any event we will table the resolution with a speech by Ambassador Bush."[৯৫] তাই দেখা যায় জর্জ বুশ ৫ ডিসেম্বর তার বক্তৃতায় ভারতকে প্রধান আক্রমণকারী হিসেবে অভিহিত করেন এবং কিসিঞ্জারের নির্দেশমত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অর্থাৎ এ সময় জাতিসংঘের মাধ্যমে মার্কিন কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ অব্যাহত থাকলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে নিরাপত্তা পরিষদে পোল্যাণ্ড ব্যতীত সবকটি অস্থায়ী সদস্য এবং স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন মিত্র চীন পাকিস্তান ঘেঁষা বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগ গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, মার্কিন কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে সোভিয়েত ভেটোর কারণে। নিরাপত্তা পরিষদে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের চাপ প্রয়োগ ব্যর্থ হলো, তখন অধিকতর বৃহৎ প্রেক্ষাপটকে যুক্তরাষ্ট্র বেছে নেয় এবং নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ ৬টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র উপমহাদেশের পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ সংকটকে সাধারণ পরিষদে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে সক্রিয় কূটনৈতি যখন নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনে চলছিল তখন ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপও অত্যন্ত আগ্রহের সাথে -এর যথার্থ উপযোগিতা নিয়ে একমত হয়েছিল।[১৬] যুক্তরাষ্ট্রের এই সমন্বিত ও পরিকল্পিত উদ্যোগের কারণেই সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিমূলক একটি প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব যখন ভারত কার্যত অস্বীকার করলো তখন নিক্সন ও কিসিঞ্জার জুটির মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সি-আই-এ প্রধান রিচার্ড হেমস জানান যে, জাতিসংঘ আরোপিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ভারত কাশ্মীর দখল করবে এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে চূড়ান্ত আঘাত হানবে। যদিও ডেপুটি এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী ক্রিস্টোফার ভ্যান এই তথ্যের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রশাসনের উচ্চমহলে তা গৃহীত হয় নি। তদুপরি দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন ছিল। ফলে সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১২ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে একটি জরুরি সভা বসে যেখানে নিক্সন, কিসিঞ্জার ও জেনারেল হেইগ উপস্থিত ছিলেন। তারা বোম্বাটে ও বল প্রয়োগ কূটনীতি (Gunboat & Coercive Diplomacy) অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের আশা ছিল যে, চীন পাকিস্তানেকে সহযোগিতা করবে। এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চুপ থাকবে না ফলে যুক্তররাষ্ট্রের পারমানবিক যুদ্ধে জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। নিক্সন ব্যক্তিগতভাবে এই ঝুঁকি গ্রহণে স্থিরচিত্ত ছিলেন।[১৭] নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির এই পরিকল্পিত হক দুটো প্রয়োগিক ক্ষেত্রে লক্ষনীয়ভাবে প্রকাশ পায়। এক. ১২ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় জাতিসংঘকে ব্যবহারে জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের উদ্যোগে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে (উপমহাদেশে যুদ্ধ বিরতির জন্যে) পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশন বসে। আমরা দেখেছি যে, ১৩ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে দ্বিতীয়বারের মত একটি প্রস্তাব পাসের উদ্যোগ নেয় কিন্তু তৃতীয় সোভিয়েত ভেটোর কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন জাতিসংঘে ভারতকে অগ্রগ্রাসী শক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার মদদদাতা হিসেবে পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করে যা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমেও প্রচারিত হয়। দুই. নিক্সন প্রশাসন পারমানবিক জাহাজ এন্টার প্রাইজের নেতৃত্বে আটটি জাহাজের একটি 'টাস্ক ফোর্স' বঙ্গোপসাগরে পাঠানার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল দিল্লী ও মস্কোর উপর চাপ প্রয়োগ করা। অর্থাৎ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ এবং সামরিক ক্ষেত্রে 'এন্টারপ্রাইজ' -এ দুটো শক্তিশালী অস্ত্রকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম স্তব্ধ করতে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

দুই.

তবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিরোধী মার্কিন কূটনীতি সফল হয় নি। প্রথমত দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী বিশ্বের দুটো শক্তিশালী মিত্র ফ্রান্স ও ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সহায়তা করে নি। তারা যেমন মার্কিন পক্ষ নেয় নি তেমনি সোভিয়েত পক্ষেও যায় নি। অর্থাৎ লন্ডন ও প্যারিসের নীরবতা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে 'মৌন সম্মতির' পুরানো প্রবাদের মত প্রমানিত হয়। ফলে জুলফিকার আলী ভুট্টো যতটা না ক্ষুব্ধ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের প্রতি তার চেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতি। তিনি ১৫ ডিসেম্বর পরিষদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার আগে বক্তৃতায় বলেছিলেন, "If Britain and France had put their powerful weight behind the international community rather than sitting on the fence, the issue might have been different. There is no such animal as a neuteral animal."[৯৮] ভুট্টোর এই বক্তব্যে সত্যতা আছে। কারণ ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নীরাবতা এবং সোভিয়েত ভেটোর কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন জাতিসংঘকে ব্যবহার করতে পারে নি। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মার্কিন জনমত, সিনেট ও কংগ্রেসসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের সহানুভূতি।

তিন.

নিরাপত্তা পরিষদকে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা গেল না তার জন্যে সবচেয়ে ভূমিকা পালন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিরোধী বিভিন্ন প্রস্তাবের বিরোধীতা করে দুভাবে। এক. সময়ক্ষেপণ দুই. ভেটো প্রয়োগের মাধ্যমে। উপরের আলোচনায় দেখা গেছে যে, পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক বিভিন্ন সময় বিতর্ক চলাকালে অধিবেশন মূলতবীর কথা বলেছেন যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মস্কোর সাথে পরামর্শ করা যায়। ফলে যেখানে অধিবেশন দু'ঘন্টার জন্যে মুলতবি করার কথা তখন তা করা হয়েছে ১২ ঘন্টা বা ১০ ঘন্টার মত। এই কৌশল যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় পথ অর্থাৎ ভেটো প্রয়োগ করেছে। ফলে ঢাকার পতনের জন্যে মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ড প্রয়োজনীয় সময় পেয়েছে। তদুপরি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘে তার তিনটি ভোট (সোভিয়েত ইউনিয়ন, বাইলোরুশ ও ইউক্রেন) বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছে। তবে একটি বিতর্ক আছে পোল্যাণ্ডের প্রস্তাব নিয়ে এবং এই বিতর্কের সূচনা করেছেন মার্কিন গবেষকদ্বয় রিচার্ড সিসন (Richard Sission) ও লিও রোজ (Leo Rose) । এ দুজন প্রথম বলতে চেয়েছেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঢাকায় আত্মসম্পর্নের মাধ্যমে ভারতের সর্বাত্মক

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক বিজয় সম্ভব হতনা এবং ভারত প্রভাবিত অপেক্ষাকৃত মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানো সম্ভব হতো না । এদের যৌথ গবেষণা গ্রন্থ ***War and Secession : Pakistan India and Creation of Bangladesh*** ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং ঐ গ্রন্থে তারা বলতে চেয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদে বসে এই প্রস্তাবটি মেনে নিতে চাইলেও নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনে ভুট্টো ঠিক উল্টো কাজ করেন। তিনি পোল্যাণ্ডের প্রস্তাবটির খসড়া সম্বলিত কাগজপত্র ছিড়ে উত্তেজিত অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা বলেছেন যে, যেহেতু পোল্যাণ্ড ছিল মস্কোর স্যাটেলাইট রাষ্ট্র এবং ভারতও সোভিয়েত নির্ভর কাজেই এ প্রস্তাবটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।[৯৯] সিসন ও লিও রোজের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলগণ যেমন রাও ফরমান আলী খান, আমির আবদুল্লা খান নিয়াজী ও গুল হাসান প্রমুখ তাদের লেখায় এ প্রস্তাব গ্রহণ না করার জন্যে ভবিষ্যতে ভুট্টোর সর্বময় ক্ষমতায় উচ্চাকাঙ্খাকে দায়ী করেছেন।[১০০] ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত বিজয়ী ভারতীয় জেনারেল জে.এফ.আর. জ্যাকবও লিখেছেন যে, পাকিস্তান এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে একটি বিপদের সম্ভাবনা ছিল এবং ভুট্টোর কারণে তারা আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হন নি।[১০১] অর্থাৎ এটা ধরে নেয়া আযৌক্তিক হবে না যে, এরা সবাই প্রভাবিত হয়েছেন সিসন ও লিও রোজের লেখা দ্বারা। কারণ এসব বক্তব্য এসেছে মার্কিন গবেষকদের গ্রন্থটি প্রকাশের পর।

এদের বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই -এর জন্যে প্রয়োজন পোল্যাণ্ডের প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করা। উল্লেখ্য ১৪ ডিসেম্বর প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় এবং ১৫ ডিসেম্বর তা সংশোধিত আকারে পুনরায় পেশ করা হয়। এতে মোট ৬টি পয়েন্ট ছিল। প্রস্তাবটি মৌল বক্তব্য হলো নিম্নরূপ :

১. পূর্বাঞ্চলে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে।

২. ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে।

৩. যুদ্ধবিরতির পর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনিকে একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থানে (বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী ?) নিয়ে জড়ো করা হবে যাতে পূর্বাঞ্চল থেকে তাদেরকে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হয়।

৪. একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক ব্যক্তিসহ অন্যান্য যারা পূর্বপাকিস্তানে আছেন এবং পাকিস্তানে ফিরতে চান তাদেরকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ফেরত পাঠানো হবে এবং কেউই যাতে নিপীড়নের মুখে না পড়ে তার গ্যারান্টি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিশ্চিত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী অপসারনের ৭২ ঘন্টার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাহার করা হবে। এই প্রত্যাহার সম্পন্ন হবে নতুনভাবে যারা ঢাকায় ক্ষমতাসীন হবে তাদের সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যৌথ পরামর্শের ভিত্তিতে।

৬. পশ্চিমাঞ্চলে ভূখণ্ড দখলের বিষয়টি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে।[১০২]

এই প্রস্তাবের সাথে সিসন ও লিও রোজের বক্তব্যে কিছু মিল থাকলেও বরং অমিলের বিষয়টি অনেক স্পষ্ট। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় লজ্জাজনক আত্মসমর্পন থেকে রক্ষা পেত। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানো সম্ভব হতোনা তা মোটেও সত্য নয়। কারণ প্রস্তাবের প্রথম অংশেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে এবং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই শর্ত পূরণের মাধ্যমেই অন্যান্য বিষয়ের বাস্তবায়ন নির্ভর করছে। সুতরাং সিসন ও লিও রো জ এই প্রস্তাবটির মূল বক্তব্যকে আংশিক বিকৃত করেছেন। তদুপরি এই প্রস্তাবের ৫ দিন আগে ১০ ডিসেম্বর পূর্বাংশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন শীর্ষ কর্মকর্তা (Second in Command) মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান ঢাকাস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তার মাধ্যমে একটি যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব করেন যা অনেকটা আত্ম সমর্পন প্রস্তাবের মতই ছিল।[১০৩] দ্বিতীয়ত, অবরুদ্ধ ঢাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ তখন স্বাধীন। বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত বাঙ্গালিদের সমষ্টিক ঐক্য ছিল পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার সম্মিলিত স্রোতের চেয়ে বেশী বেগবান। তাই সাংস্কৃতিকভাবে পাকিস্তানিদের চেয়ে স্বতন্ত্র একটি জাতির মুক্তির আকাঙ্খা কোন রাজনৈতিক আতাঁত ও সমঝোতা থামিয়ে দিতে পারতো না।[১০৪] তৃতীয়ত, একাধিক পাকিস্তানি সূত্র থেকে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানকে ত্যাগ করার জন্যে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান এম এম আহমেদের পরিকল্পনা আনুযায়ী অগ্রসর হয়েছিলেন।[১০৫]

সাধারণ পরিষদে পাসকৃত প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সিংহভাগ দেশের সরকারি মনোভাব রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতির প্রতি অনুকূলে ছিল। এর অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। প্রথমত, অসম্ভব তাড়াহুড়ার মাধ্যমে এই প্রস্তাবটি পাস হয়। প্রত্যেক বক্তার জন্যে সময় নির্ধারিত হয়েছিল মাত্র ১০ মিনিট। ফলে উপমহাদেশের অত্যন্ত জটিল বিষয়টি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পৃষ্ঠপোষকতায় আর্জেন্টিনা যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে তা ব্যাহত যুক্তিসঙ্গত হলেও অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধি তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানকারী অধিকাংশ দেশেই স্বৈরাচারী শাসকরা ক্ষমতায় ছিল যারা নিজ দেশে মানবাধিকার পদদলিত করে ক্ষমতারোহন করেছে এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে তারা আতঙ্কগ্রস্থ ছিল। ফলে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের প্রশ্নে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঐ একনায়কদের

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। তৃতীয়ত, প্রস্তাবে ভোটদানকারী ৮৮ দেশের জনসংখ্যা ছিল দখলীকৃত বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালি শরণার্থীর মোট সংখ্যার (১কোটি) চেয়েও কম। এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অনেকেই বৃহৎ প্রতিবেশীর চাপ ও আতঙ্কে বিপর্যস্ত ছিল। তদুপরি স্বৈরাচার, বর্ণবাদ ও উপনিবেশের ধারক ও বাহকরা অন্তত নৈতিক দিক থেকেও ইয়াহিয়া খানকে নিন্দা করতে পারতো না। আবার কিছু দেশ যেকোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখার পক্ষপাতি ছিল।

তবে উন্নয়ণশীল বিশ্বের দেশগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাতের কারণে জাতীয় সংহতির প্রশ্নটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। প্রস্তাব উত্থাপনকারী রাষ্ট্র আর্জেন্টিনাসহ ব্রাজিল, যুগোশ্লাভিয়া, কানাডা ইত্যাদি বৃহৎ রাষ্ট্রে যেমন জাতিগত সমস্যা ছিল, তেমনি আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশগুলোতে জাতিগত সমস্যার কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের কাছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও হুমকির কারণ হয়ে উঠেছিল। ফলে এসব দেশ অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার সংগ্রামকে ইতোপূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে এক করে দেখেছিল। ফলে এখানে বড় ধরণের ভ্রান্তি হয়। যেমন সাধারণ পরিষদে আলোচনার সময় শাদের প্রতিনিধি বলেছিলেন,

> Knowing what the consequences of a blind application of the principle of self-determination may be, my government has said 'No' to katanga and 'No' to Biafra and cannot say 'yes' in the present situation, namely the disintegration of the national unity of Pakistan.[১০৬]

বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্র কেন বিভ্রান্ত হয়েছিল তার স্বরূপটি শাদের প্রতিনিধির বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. A.M.A Muhith, ***Emergence of Bangladesh*** (Dhaka : Bangladesh Books International Ltd. 1978) P. 315

২. ***New York Times,*** (USA), December, 4, 1971

৩. ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে এক বার্তায় উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান তার সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানও একই অভিযোগ করে। দেখুন UN Doc, S/10410-AD, 4 December, 1971

৪. দেশগুলো হলো, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুণ্ডি, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সোমালিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। দেখুন UN Doc, S/10411, 4 December, 1971.

৫. পাকিস্তানি প্রতিনিধির দীর্ঘ বক্তব্যে মোট ৭৯টি প্যারা ছিল। দেখুন UN Doc, S/PV/1606, Para 49-148

৬. সমর সেনও দীর্ঘ বিবৃতি দেন। তার বক্তব্যে মোট ৩৬টি প্যারা ছিল দেখুন UN Doc, S/PV/1606 Para, 150-185

৭. জর্জ বুশের বক্তব্য ও প্রস্তাব সম্পর্কে দেখুন UN Doc, S/PV 1606 Para 189-200। এছাড়া প্রস্তাব সম্পর্কে দেখুন Apendix. 2 .

৮. UN Doc, S/PV 1606 Para 354

৯. ***Ibid,*** Para 356, 357, 358

১০. ***Ibid,*** Para 371

১১. UN Doc, S/PV / 1607, Para 75-76

১২. ***Ibid,*** Para 118

১৩. ***Ibid,*** Para 124, 125, 126

১৪. ***Ibid,*** Para 201

১৫. ***Ibid,*** Para 231

১৬. ***Ibid***- 234

১৭. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান বিষয়ে ভারতীয় লোকসভার ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতি সম্পর্কে দেখুন ***Lok Soba Debates,*** 5 December, 1971, Vol 9

১৮. UN Doc, S/PV 1608 Para 48-49

১৯. ১৯৫০ সালে কোরীয় সংকটকালে এই ফর্মুলার আবিষ্কার করা হয়। ঐ বছর ৩ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে যখন কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকিও আগ্রাসন মোকাবিলায় সাধারণ পরিষদ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২০. UN Doc, S/PV –1608 Para 17-20

২১. UN Doc, S/10429

২২. UN Doc, S/PV 1608 Para 166

২৩. *Ibid,* Para 177

২৪. *Ibid,* Para 187

২৫. ১৩টি দেশ হলো : আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, ঘানা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ইতালি, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, স্পেন, সুদান, ও তিউনেসিয়া। দেখুন UN Doc, -A/L 647, 7 December, 1971

২৬. ৩৪টি দেশের প্রস্তাব সম্পর্কে দেখুন UN Doc, A/L 647/ Rev-1, 7 December, 1971

২৭. সোভিয়েত প্রস্তাব সম্পর্কে দেখুন UN Doc, A/L 648, 7 December, 1971

২৮. UN Doc, A/PV 2002

২৯. সেপ্টেম্বর -অক্টোবরে ইয়াহিয়ার নীতিতে দেখা যায় যে, তিনি বিশেষজ্ঞ দিয়ে তথাকথিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছেন। উপ-নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালে নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের সদস্যদের শূন্য ঘোষিত আসনে বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দল ও পি পি পি এর প্রতিনিধিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। দেখুন Dawn (Karachi) Sept, Oct, 1971.

৩০. UN Doc, A/PV 2002, PP. 141-146

৩১. UN Doc, A/PV 2002, PP. 173-75

৩২. UN Doc, A/PV 2003 P.185

৩৩. *Ibid,* P.186

৩৪. *Ibid,* P.186

৩৫. *Ibid,* P.186

৩৬. *Ibid,* P.186

৩৭. *Ibid,* P.131D

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. ***Ibid,*** PP. 11-12

৩৯. ***Ibid,*** P. 131

৪০. ***Ibid,*** P. 132

৪১. সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, শুধু ধর্মীয় কারণে বিশ্বের অনেক মুসলিম রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তানের পক্ষ নেয় তেমনি ভারতের অনেক মুসলিম রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তানের পক্ষ নেয় তেমনি ভারতের অনেক মুসলমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান ঃ যখন সময় এল (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবস্থান, ১৯৯২) পৃঃ ৭৯

৪২. UN Doc, A/PV 2003, PP. 11-12

৪৩. ***Ibid,*** PP. 26-27

৪৪. ***Ibid,*** P. 27

৪৫. ***Ibid,*** P. 28

৪৬. ***Ibid,*** P. 29

৪৭. ***Ibid,*** PP. 117-120

৪৮. ***Ibid,*** PP. 117-120

৪৯. ***Ibid,*** PP. 156-160

৫০. ***Ibid,*** PP. 156-160

৫১. ***Ibid,*** PP. 132-134

৫২. ***Ibid,*** PP. 34-40

৫৩. ***Ibid,*** PP. 42-43

৫৪. ***Ibid,*** PP. 107-110

৫৫. ***Ibid,*** PP. 51-52

৫৬. ***Ibid,*** PP. 26-27

৫৭. UN Doc, S/PV 2003, PP. 28-32

৫৮. UN Doc, S/PV 2003, PP. 101-102

৫৯. ***Ibid,*** PP. 216-18

৬০. ***Ibid,*** PP. 226-227

৬১. ***Ibid,*** PP. 103-116

Dhaka University Institutional Repository

৬২. ***Ibid,*** PP. 68-82

৬৩. UN general Assembly Resolution 2793 (XXVI)

৬৪. রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য* (ঢাকা ঃ ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯৪) পৃঃ ১৩৮।

৬৫. UN Doc, S/10440, 9 December, 1971 আরোও দেখুন General Assembly Documents, A/8567.

৬৬. UN Doc, S/10445, 12 December, 1971 এবং General Assembly Documents, A/8580. ভারত বলেছিল "..to consider once again the realities of the situation were removed and pence restored."

৬৭. UN Doc, S/10446, 12 December, 1971

৬৮. SCOR S/PV 1611, Para 26

৬৯. ***Ibid,***

৭০. SCOR S/PV 1611, Para 165

৭১. ***Ibid,*** Para 190

৭২. SCOR S/PV 1612, Para 150

৭৩. UN Doc, S/10446, Rev-1, 13 December, 1971

৭৪. SCOR S/PV 1613, Para 159-161

৭৫. ***Ibid,*** Para 161

৭৬. ***Ibid,*** Para 163

৭৭. ***Ibid,*** Para 174

৭৮. UN Doc, S/10451, 13 December, 1971

৭৯. SCOR, S/PV 1614, Para 49

৮০. ***Ibid,*** Para 54

৮১. ***Ibid,*** Para 54

৮২. ***Ibid,*** Para 95

৮৩. ***Ibid,*** Para 13

৮৪. ***Ibid,***

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. ***Ibid,*** Para 22

৮৬. ***Ibid,*** Para 43

৮৭. UN Doc, S/10456, 15 December, 1971

৮৮. UN Doc, S/10455, 15 December, 1971

৮৯. UN Doc, S/10457, 15 December, 1971

৯০. SCOR, S/PV -1615, Para 139

৯১. SCOR, S/PV 1617, Para 3

৯২. ***Ibid,*** Para -5

৯৩. UN Doc, S/10465, 21 December, 1971

৯৪. Robert Jacson, ***Ibid,*** PP. 212-233

৯৫. ***Ibid,*** P. 217

৯৬. ***Ibid,*** PP. 220-222

৯৭. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বহির্বিশ্বের ভূমিকা", সালাউদ্দীন আহমেদ (সম্পাদিত) পূর্বোক্ত পৃঃ

৯৮. SCOR 1614, Para -82

৯৯. Richard Sission and Leo Rose, ***War and Secession : Pakistan, India and the Creation of Bangladesh*** (Delhi : Vistaar Publication, 1990) P.P. 219-20 & PP. 306-307.

১০০. Rao Farman Ali Khan, ***How Pakistan got Divided*** (Lahore : Jang Pub. 1992) P.92. Lt. General A.A.K. Niazi, The Betral of East Pakistan (Karachi : Oxford, 1998) P.98. এ.টি.এম. শামসুদ্দিন, *পাকিস্তান যখন ভাঙলো,* জেনারেল গুল হাসানের স্মৃতিকথা অবলম্বনে, (ঢাকা ঃ ইউপি এল ১৯৯৬), পৃঃ ৯৩

১০১. অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টোর ভূমিকায় ভারত উপকৃত হয়েছে এই ভাষ্য পাওয়া যায় ভারতীয় জেনারেল জ্যাকবের গ্রন্থে। দেখুন J.F.R Jacob; ***Surrender at Dacca : Birth of a Nation*** (Dhaka : UPL, 1997) P.97।

১০২. UN Doc, S/10453/Rev-1, 15 December, 1971

১০৩. ***The Sunday Times,*** 12 December, 1971 এছাড়া দেখুন, Rao farman Ali Khan, ***Ibid,*** PP.130-31.

১০৪. আশফাক হোসেন, "মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ" *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা,* ১৯৯৬-৯৮, পৃঃ ১০

১০৫. Niazi, ***Ibid,*** P.221 আরোও দেখুন, মুনতাসীর মামুন, "সেই সব পাকিস্তানি", *জনকণ্ঠ* আগষ্ট-নভেম্বর ১৯৯৮

১০৬. UN Doc, S/PV 2003, PP.132-34

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি সত্যিকার জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিতে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্যমান পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও আইনসঙ্গত ছিল। একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের বিরুদ্ধে বাঙালিদের পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া এই সংকটকে ইতোপূর্বে সংগঠিত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। ফলে পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক ও মিত্র দেশ সমূহের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কাটাঙ্গা ও বায়াফ্রার ঘটনার মত চিহ্নিত করা যায় নি। জাতিসংঘও কাটাঙ্গা ও বায়াফ্রার ঘটনাবলীকে যেভাবে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে বাংলাদেশ নিয়ে তা দেখা যায় নি। যদিও গণহত্যা ও মানবাধিকার প্রশ্নে জাতিসংঘ দৃশ্যত নীরব ছিল। জাতিসংঘের এই নিষ্ক্রিয়তার পেছনে অনেকগুলো ফ্যাক্টর ছিল যা বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এখানেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রশ্নে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠে। বাংলাদেশ পরবর্তীকালে জাতিসংঘের সামনে একটি 'মডেল ঘটনা' হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং নির্যাতিত অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রবাসী কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি দেয়ার রেওয়াজ চালু হয়। ফলে ১৯৭৬ সালে SWAPO (South West African Peoples Organization)-কে এবং একই সময় PLO (Palestine Liberation Organization)-কে যথাক্রমে নামিবিয়া ও ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকে জাতিসংঘ মহাসচিব তার মার্কিন নির্ভরতার কারণে নিন্দা করতে পারেন নি। তবে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি শরণার্থীদের তাৎক্ষনিক সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের ইতিবাচক ভূমিকা সবসময়ই পরিলক্ষিত হয়। শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘ তার জন্মের পর থেকে সবচেয়ে বড় ত্রাণ কার্যক্রম হাতে নেয়। কিন্তু শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধানের জন্যে যে রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল তা জাতিসংঘের সে সময়ের সমীকরণে মূর্ত হয়ে উঠেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করার জন্যে আইনগত যুক্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী ইস্যুকে অত্যন্ত কুশলতার সাথে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে শরণার্থী খাতে ব্যয় মেটানোর জন্যে জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতা দেশ ও গোষ্ঠীর সহায়তার বিষয়টি ভারত সরকার বিবেচনা করে। তবে ভারতের কাছে শরণার্থী প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সহায়তার একটি সহজ উপায়। আবার শরণার্থী সমস্যাই বাংলাদেশ আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাঁচিয়ে রাখে। মার্চ-এপ্রিলের গণহত্যা সম্পর্কে বহির্বিশ্বের নিন্দাবাদ একটা সময় দুর্বল হয়ে যেত। কারণ চীন, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির সহায়তায় পাকিস্তান এই বিরাট সমস্যাকে নিজের

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে তৎপর ছিল। বাংলাদেশ সমস্যা যে সে পথে গেল না তার একটা বড় কারণ ছিল এই শরণার্থী। ভারতীয় ও বিদেশী সংবাদপত্রে শরণার্থীদের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা দেখিয়ে ভারত অত্যন্ত কুশলতার সাথে বাংলাদেশ সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে উপস্থাপন করে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমস্যা যত দুর্বল হতে থাকলো শরণার্থীদের অমানবিক চিত্র ততই প্রবল হলো। তখন জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা UNHCR সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠনগুলোর নীরব থাকার কোন পথ খোলা ছিল না। এই চাপের মুখে ইয়াহিয়া খান দু'বার "সাধারণ ক্ষমা" ঘোষনা করলেও তাতে কোন আন্তরিকতা ছিল না। অন্যদিকে প্রাণভয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি শরণার্থীরা কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামো অপরিবর্তনীয় রেখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে রাজি ছিলেন না। আর এভাবেই শরণার্থী প্রশ্নে ভারতের হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, জাতিসংঘের বাইরে বৃহৎ শক্তিগুলো জাতীয় স্বার্থ ও ভূ-রাজনীতি অনুযায়ী 'পছন্দমাফিক' সমাধানের পক্ষপাতি ছিল। আমরা দেখেছি যে, বিশেষ করে কিসিঞ্জার একটি ছক তৈরি করেছিলেন এবং জাতিসংঘের বার্ষিক অধিবেশনকে সামনে রেখে এটি প্রস্তুত করা হয়। এর সাথে অত্যন্ত সুকৌশলে বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রশ্নটি যুক্ত করা হয়েছিল। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে মোশতাকের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে এই অধিবেশনে যোগ দেয়ার কথা ছিল। মোশতাকের নিউইয়র্ক উপস্থিতি বাংলাদেশের ইতিহাসকে অন্যদিকে নিয়ে যেত। কিন্তু প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে আকস্মিক পরিবর্তন এনে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তা হতে দেন নি। কারণ মোশতাক ও তার সমর্থকরা স্বাধীনতার বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু-এই দাবি তুলেছিল এবং নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনে এসে পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সহজেই বিতর্কিত হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে বায়ফ্রার পরিণতির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব ছিল না।

চতুর্থত, মুজিবনগর সরকার তখন যে প্রতিনিধিদলটি জাতিসংঘে প্রেরণ করে স্বাধীনতার বিঘোষিত নীতিমালার প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ফলে বৈরী পরিবেশ ও পরিস্থিতির মুখে দলটি সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রচারণা করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জাতিসংঘে বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি কিছুটা হলেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন । ডিসেম্বরে যখন যুদ্ধবন্ধ ও বিশ্বশান্তি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হয়, তখন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো প্রশ্নে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে তীব্র বাক বিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, তাকে বক্তব্যদানের সুযোগ দেয়া হবে না তবে পরিষদে তার লিখিত একটি পত্র বিলি করা হবে। অর্থাৎ এক ধরনের পরোক্ষ স্বীকৃতি দেয়া হয়। এসব বিবেচনায় বলা যায় যে, মুজিবনগর সরকারের জন্যে জাতিসংঘ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত, নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ প্রশ্নে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে নি। নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রলম্বিত করার জন্য চীন-মার্কিন উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় প্রধানত সোভিয়েত ভেটোর কারণে। তদুপরি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নিরপেক্ষ ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে সহায়ক হয়েছিল। বিশেষ করে সে সময় পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের দুটো শীর্ষস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশ ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়। ফলে জাতিসংঘে মার্কিন উদ্যোগ দুর্বল হয়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের নতুন মিত্র চীনের অতি উৎসাহ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতকে এককভাবে দোষারোপ ইত্যাদি কোন প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনতে পারে নি। অবশ্য কিসিঞ্জার পরবর্তীকালে দাবি করেছেন যে, জাতিসংঘ তাদের কূটনীতি এবং বঙ্গোপসাগরের দিকে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করা।

তবে সাধারণ পরিষদে যখন বিষয়টি স্থানান্তরিত হয় তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি সমর্থনসূচক একটি প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (১০৪-১১) পাস হয়ে যায়। ১৯৭১ এর প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, জাতীয় সংহতির প্রচলিত ধারণার পক্ষে এই ভোট পড়েছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাকিস্তানই একমাত্র রাষ্ট্র যার বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী (সমগ্র পাকিস্তানের ৫৫%) আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের প্রশ্নে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। মালয় ফেডারেশন থেকে সিঙ্গাপুরের পৃথকীকরণের ঘটনার পর এমনটি আর হয় নি। সিঙ্গাপুর স্বাধীন হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়। সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সমর্থনহীনতার একটি কারণ ছিল ভারত। ভারত সে সময় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্ধুহীন অবস্থায় ছিল। ১৯৬০-এর দশক থেকে সে দেশে ব্যাপকভাবে কলকারখানা, ব্যাংক,বীমা জাতীয়করণ শুরু হয়। ফলে পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র তা পছন্দ করে নি। এ সময় ভারত-সোভিয়েত মিত্রতা একটি প্রমানিত বিষয় ছিল। তদুপরি চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব সত্তর দশকের গোড়ায় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ফলে চীন-যুক্তরাষ্ট্র-মুসলিম দেশগুলোর জোট জাতিসংঘে একটি বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো অনেকেই মনে করেছিল যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে।

অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সম্পৃক্তির কারণে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের মিত্রদের পক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি মনোভাবকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়। ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা তখন কয়েক দশকের পুরানো বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ফলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রটির বিভক্তি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ মানসিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই দেখা যায় যে, সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে একটি

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম রাষ্ট্রও বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ায় নি। শুধু আফগানিস্তান ও ওমান ভোটদানে বিরত ছিল। আফ্রিকাসহ তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র দেশগুলো জাতীয় সংহতির বিষয়কে বড় করে দেখেছিল। এসব রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ছিল এবং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর হুমকির কারণে সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। গোত্র ও গোষ্ঠীগত বিভাজনের দিক থেকে আফ্রিকার পরিস্থিতি ছিল অনেকটা 'মোজাইক' (Mosaic) এর মত। এসব দেশে 'চৈনিক মডেল' খুবই জনপ্রিয় ছিল। চীন একটি বিশাল রাষ্ট্র এবং জাতীয় ঐক্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দেশটি দক্ষতার পরিচয় দেয়। ফলে তৃতীয় বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন রাষ্ট্র যখন ১৯৭১ এর প্রেক্ষাপটে খুবই জনপ্রিয় প্রপঞ্চ জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পক্ষে উচ্চকণ্ঠ হয়, তখন আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো বিনাবাক্য ব্যয়ে সমর্থন জানায়। দেখা যায় যে, আফ্রিকার কোন রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি সহানুভূতিশীল ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি। একমাত্র মালাউই ও সেনেগাল ভোটদানে বিরত থাকে।

কিন্তু চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ এবং মুসলিম দেশগুলো সহানুভূতি সত্ত্বেও পাকিস্তানের পরাজয় ঠেকানো গেল না। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে উপমহাদেশের মানচিত্রে নতুন বিন্যাস ঘটে। একটি চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যাওয়ায় বিশ্বের অনেক দেশ স্বস্তিবোধ করে। তবে জাতিসংঘের প্রান্তিক ভূমিকা শুধুমাত্র ত্রাণকার্যক্রম ও মানবিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে। সর্বোপরি বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের জয়। রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, অভ্যন্তরীণ বিষয় ইত্যাদি প্রচলিত ব্যবস্থার অজুহাত তুলে যে সামরিক গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাধীনতার দাবিকে গণহত্যা ও জাতিগত নিপীড়ণের মাধ্যমে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে তার পরাজয় ঘটে। এজন্যে বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ঘটনা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ক

ক. বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পরিচিতি

১. আবু সাঈদ চৌধুরী ঃ সাবেক রাষ্টপতি ও উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়। তিনি উপাচার্য হিসাবে জেনেভাতে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দিতে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে ছাত্র হত্যার কারনে তিনি প্রদেশিক শিক্ষা সচিব বরাবর পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন। এর পর পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। লন্ডনে সদর দপ্তর স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে তিনি অসামান্য কাজ করেন। ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি প্রয়াত।

২. আব্দুস সামাদ আজাদ ঃ সে সময়ের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও এম.এন.এ.। আওয়ামীলীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সর্বোচ্চ ব্যাক্তিদের একজন। বর্তমানে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

৩. মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী ঃ সে সময়ের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও এম.এন.এ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সরকার ওয়াশিংটনে যে বেসরকারি দুতবাস খুলে তার প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। বর্তমানে প্রয়াত।

৪. ডঃ মফিজ চৌধুরী ঃ এম.এন.এ, পেশায় বিজ্ঞানী ছিলেন, পরে সরকারি চাকুরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন তিনি।

৫. সৈয়দ আব্দুস সুলতান ঃ এম.এন.এ, পেশায় আইনজীবী ও সাহিত্যিক ছিলেন। এক সময় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি লিডার ছিলেন। তিনি মুজিবনগর সরকারের শাসনতন্ত্র প্রনয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে প্রয়াত।

৬. সিরাজুল হক ঃ এম.এন.এ, পেশায় একজন আইনজীবী। তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সরকারের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে কাজ করছেন।

৭. ডঃ আসহাবুল হক ঃ ১৯৭১ এ চুয়াডাঙ্গা থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ছিলেন । একজন নামী চিকিৎসক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। ছাব্বিশে মার্চের পরে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক নেতা যার সাক্ষাৎকার মার্কিন টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় তিনি অচিরেই পরিচিতি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ফনিভূষণ মজুমদার ঃ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর মন্ত্রী হয়েছিলেন। বর্তমানে প্রয়াত।

৯. ফকির শাহাবুদ্দিন ঃ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ঢাকা হাইকোর্টের একজন প্রতিশ্রুতিশীল আইনজীবী ছিলেন। মুজিবনগর সরকারের প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ের রাজনৈতিক কর্মকর্তা ছিলেন।

১০. অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ঃ ন্যাপ প্রধান। ১৯৭১-এ সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে রাজনীতি করলেও তেমন সক্রিয় নন।

১১. ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় অংশ নেন। আগরতলা হয়ে কলকাতায় পৌছেন। যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে কাজ করেন।

১২. রেহমান সোবাহান ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা ছেড়ে মুজিবনগর হয়ে এপ্রিলে লন্ডন পৌছান। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জোরালো প্রচারণায় অবতীর্ণ হন।

১৩. এ,এফ,এম আবুল ফতেহ ঃ তিনি ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

১৪. খুররাম খান পন্নী ঃ ১৯৭১-এ ফিলিপাইনে পাকিস্তানের রাষ্টদূত ছিলেন। একাত্তরের মাঝামাঝি মুজিবনগর চলে আসেন।

১৫. সৈয়দ আনোয়ারুল করিম ঃ তিনি নিউইয়র্কে পাকিস্তান দূতাবাসে উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি থাকা কালে ৪ আগষ্ট পদত্যাগ করেন।

১৬. আবুল মাল আব্দুল মুহিত ঃ ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি দুতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সিলর ছিলেন। ৪ আগষ্ট পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও মন্ত্রী ছিলেন।

১৭. এ.এইচ. মাহামুদ আলী ঃ ১৯৭১-এ তরুণ কূটনৈতিক। নিউইয়র্কে পাকিস্তানি দূতাবাস থেকে ২৬ এপ্রিল পদত্যাগ করেন এবং স্বাধনীতা যুদ্ধে যোগ দেন। ২৭ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার তাকে বহিষ্কার করে। বর্তমানে তিনি ব্রিটেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত।

সূত্র : আবু সাঈদ চৌধুরী *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা : ইউপিএল ১৯৯০। আব্দুস সামাদ আজাদ, রেহমান সোবহান, আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও এ.এইচ, মাহমুদ আলীর সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের বাঙালি সদস্য

১. মাহমুদ আলী (প্রতিনিধিদলের নেতা)

২. জুলমত আলী খান (এ্যাডভোকেট)

৩. শাহ আজিজুর রহমান (এ্যাডভোকেট)

৪. মিসেস রাজিয়া ফয়েজ (গৃহবধূ)

৫. ডঃ ফাতিমা সাদিক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

৬. এ.টি. সাদী (এ্যাডভোকেট)

সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

APEDIX 2

POLAND REVESED DARFT RESOLUTION*

The Security Council,

Gravely concerned over the military conflict on the Indian subcontinent, which constitutes an immediate threat to international peace and security.

Having heard the statements by the Foreign Minister of India and the Deputy Prime Minister of Pakistan,

Decides that:

1. In the eastern theatre of conflict, the power will be peacefully transferred to the representatives of the people, lawfully elected in December 1970;

2. Immediately after the beginning of the process of power transfer, the military actions in all the areas will be ceased and an initial cease-fire will start for a period of 72 hours;

3. After the immediate commencement of the initial period of cease-fire, the Pakistan armed forces will start withdrawal to the evacuation from the eastern theatre of conflict;

4. Similarly; the entire West Pakistan civilian personnel and other persons willing to return to West Pakistan, as well as the entire East Pakistan civilian personnel and other persons in West Pakistan willing to return home, will be given an opportunity to do so under the supervision of the United Nations, with the guarantees on the part of all appropriate authorities concerned that nobody will be subjected to repressions:

5. As soon as within the period of 72 hours the withdrawal of the Pakistan troops and their concentration for that purpose will have started, the cease-fire will become permanent. The Indian armed forced will be withdrawn from East Pakistan. Such withdrawal of troops will begin upon consultations with the newly established authorities organized as a result of the transfer of power to the lawfully elected representative of the people;

6. Recognizing the principles, according to which territorial acquisition made through the use of force will not be retained by either party to the conflict, the Governments of India and Pakistan will immediately begin negotiations through appropriate representatives of their armed forces with a view to the speediest possible implementation of this principle in the western theatre of military operations.

* UN, Doc. S/10455, Moved on 15 December 1971

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি (SELECT BIBLIOGRAPHY)

ক. দলিলপত্র. (Official Records)

মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্র, ১৯৭১.

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের দলিলপত্র (বাংলাদেশ আরকাইভস).

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ১ম থেকে ১৫ খন্ড। হাসান হাফিজুর.রহমান (সম্পাদিত) ঢাকা : তথ্যমন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২.

জাতিসংঘ সনদ, ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ১৯৮৪

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র , ১৯৯৮

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভার কার্যবিবরণী ১৯৭১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Security Council Official Records, S/PV Series-1971

General Assembly Official Records, 1971

ECOSOC Official Records, 1971

UNCHR Official Records, 1971

Bangla Desh Documents, New Delhi : Ministry of External Affairs, Government of India, 1971

Lok Sabha Proceedings, 1971, New Delhi : Lok Shova Secretariat, India.

Kessing Contemporary Archives, London : Kessing Publishing Ltd. 1972.

A Dictionary of Politics, London : Europa Publication, 2nd Edition, 1993

Encyclopedia of Britanica, Chicago : Encyclopedia of Britanica Inc. 1981

খ. পত্রপত্রিকা (News Papers)

দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকা) ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২

দৈনিক পাকিস্তান (ঢাকা) ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২

দৈনিক সংবাদ (ঢাকা) ১৯৭১, ১৯৭২

দৈনিক পূর্বাদেশ (ঢাকা) ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পয়গাম (ঢাকা) ১৯৭০, ১৯৭১

জয়বাংলা (মুজিব নগর) ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধ (মুজিবনগর) ১৯৭১

স্বাধীন বাংলা (মুজিবনগর) ১৯৭১

Bangladesh Weekly (Mujibnagar) 1971

Bangladesh Today, News Letter, Bangladesh Mission, London)1971

Pakistan Observer (Dhaka), 1970, 1971

Morning News (Dhaka) 1970, 1971

The Dawn, (Karachi) 1971

The Times of India (India) 1971

The Statesman (India) 1971

Hindustan Times (India) 1971

The Times (Goa, India) 1971

The Amrita Bazar Patrika (India) 1971

দৈনিক আনন্দবাজার (কলকাতা) ১৯৭১-১৯৭২

দৈনিক যুগান্তর (কলকাতা) ১৯৭১

দৈনিক কালান্তর, (কলকাতা) ১৯৭১

দৈনিক সংবাদ, (আগরতলা) ১৯৭১

প্রাভদা (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ১৯৭১

New Yorks Times (USA) 1971

Newsweek (USA) 1971

Times (USA) 1971

The Guardian (UK) 1971

The Observer (UK) 1971

The Times (UK) 1971

Dhaka University Institutional Repository

Sunday Times (UK) 1971

The Economist (UK) 1971

গ. প্রবন্ধপঞ্জি (Articles)

হোসেন আবু মোঃ দেলোয়ার ও হোসেন, আশফাক, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা : আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও জাতিসংঘ", দ্রষ্টব্য *নিবন্ধমালা* (ঢাকা : উচ্চতর মানবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

হোসেন, আশফাক, "মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ" দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৬-৯৮

হোসেন, আশফাক , "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা ও ভারত" (ঢাকা : উচ্চতর সমাজবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ। অক্টোবর, ১৯৯৮।

Ali, Mehrunisa, "East Pakistan Crisis : International Reaction," Sarwar Hassan (Edited) ***Pakistan Horizon,*** Vol XXIV, No 2, Second Quarter,1971, (Karchi : Pakistan Institute of International Affairs) PP. 31-58.

Faruki A. Kamal, "India's Role in the East Pakistan Crisis : Legal Aspects" ***Ibid,*** PP.18-30

Islam, M. Rafiqul, "The Territorial Integrity of a State versus Secessionist Self-determination of its People. The Bangladesh Experience," ***BIISS Journal,*** Vol 5, No 1, January, 1984, PP.1-41.

Khair, Sumaiya, "Refugees in Armed Conflicts and International Disturbances : Protection & Assistance." ***BIISS Journal***, Vol 12, No 3, 1991

Saad Ali Attar, "The Legal Formation of Refugee Problem" ***UNHCR***. Dhaka1995.

ঘ. সহায়ক গ্রন্থ (Books)

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ঢাকা :এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩

আলিনুজ্জামান, *আমার একাত্তর* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭)

আনন্দ পাবলিশার্স, *বাংলা নামে দেশ,* কলকাতা : আনন্দ ১৯৯০

আলী আহসান, সৈয়দ, *যখন সময় এল,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবস্থান, ১৯৯২

আহমদ, সালাউদ্দিন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশর মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৮-১৯৭১,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭

আহমেদ, হুমায়ুন, *অনন্ত অক্ষরে,* ঢাকা : কারেন্ট বুক হাউস, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, আবু সাঈদ, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯০

বারী, ফজলুল, *একাত্তরের কলকাতা*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩

বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা*, ঢাকা : মৈত্রী সমিতি, ১৯৮৭

ভট্টাচার্য, সুভাষ. *বিশ্ব ইতিহাস অভিধান*, কলকাতা : কে. পি বাগচী কোং, ১৯৯২

মতিন, আবুল, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি*, লন্ডন : র‍্যাডিকেল এশিয়া পাবলিকেশনস, ১৯৯১

মোহিত আবুল মাল, আব্দুল *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬

মামুন, মুনতাসীর ও রায়, জয়ন্তকুমার, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-৯০*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৫

রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, অনুবাদ ফরিদ কবির, ঢাকা : ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯৪

হাবীব, হারুন, *মুক্তিযুদ্ধ : ডেটলাইন আগরতলা*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

হাসান, মঈদুল, *মূলধারা ৭১*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৮৯

হাসান, মাহমুদ, *দিনপঞ্জি একাত্তর*, ঢাকা : পাইওনিওর পাবলিকেশনস, ১৯৯১

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা*, ঢাকা : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮২

Ahmad, Kabir Uddin. ***Breakup of Pakistan: Background and Prospects of Bangladesh.*** London : Social Science Publishing,1972.

Ahmad, Kamrudin. ***The Social History of East Pakistan.*** Dhaka : Pioneer Press, 1967.

Ahmad, Moudid. ***Bangladesh : Constitutional Quest of Autonomy, 1950-1971***. Wiesbaden : Steiner, 1978 ;

Akhtar, Jamna Das. ***The Saga of Bangladesh.*** Delhi : Oriental Publishers, 1971.

Ali, Tariq, ***Pakistan : Military Rule or People's Power.*** New York : Morrow, 1970.

Anderson, Jack, with George Clifford. ***The Anderson Papers.*** New York : Ballantine Books, 1973. Pages 255-326 deal with the ***Bangladesh Crisis.***

Ayoob, Mohammed, and K. Subramanyam. ***The Liberation War.*** New Delhi : S. Chand, 1972.

Ayoob, Mohammed, et al. ***Bangladesh : A Straggle for Nationhood.*** Delhi : Vikas, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

Ball, Nicole. ***Regional Conflicts and the International System: A Case Study of Bangladesh***. Brighton : Institute for the Study of International Organizations, University of Sussex, 1974.

Baujyan, Md. Abdul Wadud. ***Emergence of Bangladesh and Role of Awami League.*** New Delhi : Vikas, 1982.

Bindra, S.S. ***Indo-Bangladesh Relations.*** New Delhi : Deep and Deep Publishers, 1982.

Biswas, Sukumar. ***The Emergence of Bangladesh : The Japanese Viewpoints,*** Tokyo : IDE, 1997

Blikenberg, Lars, ***India- Pakistan : The History of Unsolved Conflicts.*** Munksgaard : Dansk Undenrigspolitisk Institut, 1972.

Chakrabarti S.K. ***The Evaluation of Politics in Bangladesh, 1947-78.*** New Delhi : Associated Publishing House, 1978.

Chatterjee, Sisir. ***Bangladesh : The Birth of a Nation.*** Calcutta : Book Exchange, 1972.

Chopra, Pran. ***India's Second Liberation.*** Delhi : Vikas, 1973.

Choudhury, A .K. ***The Independence of East Bengal : A Historical Process.*** Dhaka : Jatiya Grantha Kendra, 1984.

Choudhury, G.W. ***The Last Days of United Pakistan.*** Bloomington : Indiana University Press, 1974.

Choudhury, G.W. ***India, Pakistan, Bangladesh and the Major Powers,*** New York : Free Press, 1975

Das, Mitra. ***From Nation to Nation*** : ***A Case Study of Bengali Independence*** Calcutta : Minerva Associates, 1981.

Farman Ali Khan, Rao. ***How Pakistan Govt. Divided*** Lahore : Publishers, 1992

Gandhi, Indira. ***India and Bangladesh: Selected Speeches and Statements, March to December 1971.*** New Delhi : Orient Longman,1972.

Golam Mostafa : ***National Interest and Foreign Policy of Bangladesh-USSR*** : UPL, 1996

Jackson, Robert W. ***South Asian Crisis,*** New Delhi : Vikas, 1978

Jahan, Rounaq, ***Pakistan : The Failure of National Integration.*** New York : Columbia University Press, 1972

Jain, J.P ***China, Pakistan and Bangladesh***, Delhi : Radiant Publishers, 1974

Dhaka University Institutional Repository

Khan, Mohammed Ayub. ***Friends Not Masters : A Political Autobiography.*** London : Oxford, 1968

Khan, Fazal Muqueem, ***Pakistan's Crisis in Leadership.*** Islamabad : National Book Foundation,1973.

Khan, Zillur R, and A.T.R Rahman. ***Autonomy and Constitution Making : The Case of Bangladesh.*** Dhaka : Green Book House,1973

Kissinger, Henry, ***White House Years.*** Boston : Littlebrown, 1979. Pages 842-918 are on Bangladesh.

Krishan, Vice Admiral N. ***No Way but Surrender : An Account of the Indo-Pakistan War in the Bay of Bengal, 1971***. New Delhi : Vikas, 1980.

Lifschultz, Lawrence. ***Bangladesh : The Unfinished Revolution***. London : Zed Press, 1979.

Mansingh, Surjit. ***India's Search for Power : Indira Gandhi's Foreign Policy, 1966-1982.*** New Delhi : Sage Publications, 1984.

Mascarenes, Anthony. ***The Rape of Bangladesh.*** New Delhi : Vikas, 1971.

Mahmood, Safder, ***Pakistan Divided,*** Delhi : Alpha Bravo, 1983.

Malhotra, Inder, ***Indira Gandhi : A Personal and Political Biography,*** London : Hodder & Stoughton, 1989

Maswani, A,M.K. ***Subversion in East Pakistan.*** Lahore : Amir Publishers, 1979.

Meharish, B.N. ***War Crime Genocide : The Trial of Pakistani War Criminals,*** Delhi : Oriented Publications 1972

Misra, K.P. ***Role of the United Nations in the Indo-Pakistan Conflicts,*** 1971, Delhi : Vikas Publishing, 1973.

Momen, Nurul. ***Bangladesh in the United Nations : A Study of Diplomacy,*** Dhaka : UPL, 1987

Mukhergee, Subimal Kumar, ***Bangladesh and International Law,*** Calcutta : West Bengal Political Association, 1971

Niazi, A.A.K ***The Betral of East Pakistan,*** Karachi : Oxford, 1998.

Quaderi, Quader, Fazlul. ***Bangladesh Genocide and World Press,*** Dhaka : Qudir Publications, 1972.

Dhaka University Institutional Repository

Rahman, Mizanur. ***Emergence of a New Nation in a Multi-Polar World : Bangladesh.*** Washington, D.C. : University Press of America, 1978.

Salik, Siddiq. ***Witness to Surrender.*** Karachi : Oxford University Press, 1977.

Sharma, Shri Ram. ***Bangladesh Crisis and Indian Foreign Policy***. New Delhi : Young Asia, 1978.

Singh, Maj. Gen. Lachhman. ***Indian Sword Strikes in East Pakistan.*** New Delhi : Vikas, 1979.

Singh, Maj. Gen. Sukhwant. ***The Liberation of Bangladesh. New*** (Delhi : Vikas, 1980).

Tewari, I.N. ***War of Independence in Bangladesh : A Documentary Study,*** Varanasi : Navachetra Prakash.

Tim, R.W, ***Forty Years in Bangladesh,*** Dhaka : Caritas Bangladesh, 1995

Tomas W. Oliver. ***The United Nations in Bangladesh,*** New Jersy : Princeton University Press, 1978